



ধা রা বা হি ক উপ ন্যা স

চৈতন্য

হুমায়ূন আহমেদ

পর্ব ১

‘দেয়াল’-এর গল্প শুরু হবে ১৯৭৫ সনের এক ভাদ্রমাসের সন্ধ্যায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি নামবে নামবে করছে। আকাশে অস্থিরতা, দেশের মানুষের মধ্যেও অস্থিরতা। অস্থিরতার কারণ স্পষ্ট না। অনায়ে আছে শিওরা। ধানমন্ডির বক্সিশ নম্বর সড়কের একটি শিওকে তার মা ফুটবল কিনে দিয়েছেন। ফুটবল দু’হাতে বুকের কাছে ধরে সে ছোট্টাছুটি করছে। সে তার বাবার সঙ্গে ফুটবল খেলবে। বাবা এখনো বাসায় ফেরেন নি বলে খেলা শুরু হয় নি। শিওটির নাম শেখ রাসেল।

শফিক পরপর দু’কাপ চা খেয়েছে। দোকানিকে টাকা দিতে গিয়ে দেখে সে মানিব্যাগ আসে নি। এরকম ভুল তার সচরাচর হয় না। তার আরেক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করছে। চায়ের সঙ্গে সিগারেট। শফিক মনস্থির করতে পারছে না। সঙ্গে মানিব্যাগ নেই—এই তথ্য দোকানিকে আগে দেবে নাকি চা-সিগারেট খেয়ে তারপর দেবে!

শফিকের হাতে বিভূতিভূষণের একটা উপন্যাস। উপন্যাসের নাম ইছামতি। বইটির দ্বিতীয় পাতায় শফিক লিখেছে—অবন্তিকে শুভ জন্মদিন। বইটা নিয়ে শফিক বিরক্ত অবস্থায় আছে। বইটা অবন্তিকে সে দিবে নাকি ফেরত নিয়ে যাবে? এখন কেন জানি মনে হচ্ছে ফেরত না নেওয়াই ভালো।

অবন্তির বয়স ষোল। সে ভিকারুননিসা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে। শফিক

তাকে বাসায় অংক শেখায়। আজ অবন্তির জন্মদিন। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শফিককে বলা হয় নি। অবন্তি শুধু বলেছে, তের তারিখ আপনি আসবেন না। ওই দিন আমাদের বাসায় ঘরোয়া একটা উৎসব আছে। আমার জন্মদিন।

যে উৎসবে শফিকের নিমন্ত্রণ হয় নি, সেই উৎসবের উপলক্ষে উপহার কিনে নিয়ে যাওয়া অবন্তির ব্যাপার। শফিক ঠিক করে রেখেছে বইটা অবন্তিদের বাড়ির দারোগ্যানের হাতে দিয়ে আসবে। সমস্যা একটাই—দারোগ্যান সবদিন থাকে না। গেট থাকে ফাঁকা। তবে আজ যেহেতু বাড়িতে একটা উৎসব, দারোগ্যানের থাকার কথা।

শফিক দোকানির দিকে তাকিয়ে বলল, মানিব্যাগ আনতে ভুলে গেছি। আপনার টাকাটা আগামীকাল ঠিক এই সময় দিয়ে দিব। চলবে?

দোকানি কোনো জবাব দিল না। সে গরম পানি দিয়ে কাপ ধুচ্ছে। তার চেহারার সঙ্গে একজন বিখ্যাত মানুষের চেহারার সুসাদৃশ্য আছে। মানুষটা কে মনে পড়ছে না। দোকানির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো মনে পড়বে। শফিক অবন্তির সঙ্গে বলল, আমাকে আরেক কাপ চা খাওয়ান, আরেকটা ক্যাপসিন সিগারেট। আগামীকাল ঠিক এই সময় আপনার সব টাকা দিয়ে দেব।

দোকানি কাপ ধোয়া বন্ধ রেখে শফিকের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। দোকানির



চোখের চাউনি দেখে শফিক নিশ্চিত হলো, তার চেহারা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের মতো। আব্রাহাম লিংকন লম্বা, আর এ বটে।

দোকানি বলল, আমার হাত ভিজা, আপনে বৈয়াম খুইলা ছিরগেট নেন।

বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। কোঁটা ঘন হয়ে পড়ছে। আশ্বিনের কথা ব্যাঙ ডাকছে। শফিক দাঁড়িয়ে আছে ধানমণ্ডি নয় নম্বর রোডের মাথায়। আশপাশে ডোবা নেই যে ব্যাঙ থাকবে। ধানমণ্ডি লেকের কোনো ব্যাঙ কি রাস্তায় নেমে এসেছে? বর্ষায় কই মাছ পাড়া বেড়াতে বের হয়, ব্যাঙরা কি বের হয়?

শফিক ইছামতি বইটা সিগারেটের বৈয়ামের উপর রেখে চায়ের গ্লাস হাতে নিয়েছে। দোকানি বলল, আপনে ভিজতেছেন কী জন্যে? চালার নিচে খাড়ান। ভাদ্রমাসের বৃষ্টি আসে আর যায়। এক্ষণ বৃষ্টি থামবে। আসমানে তারা ফুটবে।

শফিক দোকানির পাশে বসেছে। সিগারেট পরিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। চায়ের দোকানের সামনে কালো রঙের একটা কুকুর এসে দাঁড়িয়েছে। কুকুরটা থকাও। দেশি কুকুর এত বড় হয় না।

দোকানি বলল, কুত্তার শইলটা দেখছেন? হালা ভোলা জোয়ান।

শফিক বলল, হুঁ। বিরাট।

বড়লোকের কুত্তার সাথে দেশি কুত্তা মিলছে বইলা এই জিনিসের পয়দা হইছে।

দোকানি বৈয়াম খুলে একটা টোস্ট বিস্কিট ছুড়ে দিল। কুকুর বিস্কিট কামড়ে ধরে চলে গেল।

দোকানি বলল, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় এই কুত্তা আছে। এরে একটা বিস্কুট দেই, মুখে নিয়া চইল্যা যায়। ঠিক করছি কুত্তাটারে ভালোমতো একদিন খানা দিব। গোস-ভাত।

শফিক বলল, আপনার চেহারার সঙ্গে অতি বিখ্যাত একজন মানুষের চেহারার মিল আছে।

দোকানি বলল, গরিবের আবার চেহারা কী?

আপনার নাম কী?

গরিবের নামও থাকে না। বাপ-মা কাদের বইল্যা ডাকে। ধরেন আমার নাম কাদের।

ছাতা মাথায় কে যেন এগিয়ে আসছে। অল্প বৃষ্টিতেই পানি জমে গেছে। লোকটা পানিতে ছপ ছপ শব্দ

করতে করতে আসছে। শফিক অগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। দূর থেকে মানুষটাকে চেনা চেনা লাগছে কিন্তু পুরোপুরি চেনা যাচ্ছে না। আজকাল শফিকের এই সমস্যা হচ্ছে, প্রথম দর্শনেই কাউকে সে চিনতে পারছে না।

মাটির সাব এইখানে কী করেন? অবস্থিদের বাড়ির দারোয়ান কালাম ছাতা মাথায় দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় বিড়ি কিনতে এসেছে। শফিক বিব্রত গলায় বলল, বৃষ্টিতে আটকা পড়েছি।

কালাম বলল, ঘরে আসেন। ঘরে আইসা বসেন।

শফিক বলল, ঘরে যাব না। তুমি অবস্থিকে এই বইটা দিয়ো। তার জন্মদিনের উপহার। বই দিতে এসে বৃষ্টিতে আটকা পড়েছি। বইটা সাবধানে নিয়ো, বৃষ্টিতে যেন ভিজেনা। তোমার আপার হাতেই দিয়ো।

কালাম গলা নামিয়ে বলল, বই আকার হাতেই দিব। আপনি টেনশান কইরেন না।

কালাম বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাচ্ছে না। সে দুই শলা সিগারেট কিনতে এসেছে, মাষ্টারের সামনে কিনতে পারছে না। শফিক উঠে দাঁড়াল। বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করা অর্থহীন, এই বৃষ্টি থামবে না।

ভয়ঙ্কর কালো কুকুরটা আবার উদয় হয়েছে। সে যাচ্ছে শফিকের পেছনে পেছনে। শফিক কয়েকবার বলল, 'এই যা বললাম, যা।' লাভ হলো না। পানিতে ছপ ছপ শব্দ তুলে কুকুর পেছনে পেছনে আসছেই। হঠাৎ ছুটে এসে পা কামড়ে ধরবে না তো? শফিক হাঁটার গতি বাড়াল। কুকুরও তাই করল। ভালো যন্ত্রণা তো!

অবস্থির দাদা সরফরাজ খানের হাতে ইছামতি বই। দারোয়ান বইটা সরাসরি তাঁর হাতে দিয়েছে। তিনি প্রথমে পাতা উল্টিয়ে দেখলেন, লুকানো কোনো চিঠি আছে কি না। চিঠি পাওয়া গেল না। বইটা তিনি ভ্রায়ারে লুকিয়ে রাখলেন। আগে নিজে পড়ে দেখবেন। বইয়ের লেখায় কোনো ইঙ্গিত কি আছে? হয়তো দেখা যাবে এক প্রাইভেট মাষ্টারকে নিয়ে কাহিনী। বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে তার প্রণয় হয়। বাড়ি থেকে পালিয়ে সেই মেয়ে মাষ্টারকে বিয়ে করে। তাদের সুখের সংসার হয়। গল্প-উপন্যাস হলো অল্পবয়সী

মেয়েদের মাথা খারাপের মন্ত্র। তাঁর মতে, দেশে এমন আইন থাকা উচিত যেন বিয়ের আগে কোনো মেয়ে 'আউট বই' পড়তে না পারে। বিয়ের পরে যত ইচ্ছা পড়ুক। তখন মাথা খারাপ হলে সমস্যা নাই।

সরফরাজ খান ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। নাতনির জন্মদিনের নিমন্ত্রিত অতিথিরা এখনো কেউ আসে নি। যেভাবে বৃষ্টি নামছে কেউ আসবে কি না কে জানে। রাতেরবেলা এমনিতেই কেউ বের হতে চায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শোচনীয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যে অস্ত্র মানুষের হাতে চলে গিয়েছিল তা সব উদ্ধার হয় নি। দিন-দুপুরেই ডাকাতি-ছিনতাই হচ্ছে। যাদের হাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কথা, তাদের কেউ কেউ ডাকাতি-ছিনতাই-এ নেমেছে। সরফরাজ খানের মনে হলো, ভারতের সেনাবাহিনীকে এত তাড়াতাড়ি বিদায় করা ভুল হয়েছে। এরা থাকত আরও কিছুদিন।

সরফরাজ গলা উঠিয়ে এ বাড়ির একমাত্র কাজের মেয়ে রহিমাকে ডাকলেন। রহিমা পনেরো বছর ধরে এ বাড়িতে আছে। কর্তৃত্ব নিয়ে আছে। যতই দিন যাচ্ছে তার কর্তৃত্ব ততই বাড়ছে। এখন সে মুখে মুখে কথা বলে।

রহিমা এসে দাঁড়াল, মাথায় ঘোমটা দিতে দিতে বলল, কী বলবেন তাড়াতাড়ি বলেন। পাক বসাইছি। বুড়া গরুর মাংস অনাচ্ছে, সিদ্ধ হওনের নাম নাই।

সরফরাজ বললেন, এখন থেকে মাষ্টার যতক্ষণ অবস্থিকে পড়াবে তুমি সামনে বসে থাকবে।

এইটা কেমন কথা! আমার কাইজকাম কে করব?

সরফরাজ কঠিন গলায় বললেন, এ বাড়িতে আমি আর অবস্থি এই দুজন মানুষ। এত কাজকর্ম কোথায় দেখলে? শুধু বাড়তি কথা।

রহিমা বলল, দুইজন মানুষ এইটা কী বললেন? আমরাও মানুষের মধ্যে ধরেন না? আমি আছি, ডেরাইভার ভাই আছে, দারোয়ান আছে। সবের পাক এক চুলায় হয়। পাঁচজন মানুষ। আপনার কথা শেষ হইছে? এখন যাব?

অবস্থি কোথায়?

আফা ছাদে।

বৃষ্টির মধ্যে সে ছাদে কী করে? এইটা আফারে জিগান। আমি

ক্যামানে বলব! যে আসামি সে
জবানবন্দি দিবে, আমি আসামি না।
কথাবার্তা হিসাব রেখে বলবে।
এখন যাও, অবস্থিকে আমার কাছে
পাঠাও। আর যে কথা প্রথম বললাম,
অবস্থি যখন তার মাষ্টারের কাছে
পড়বে তুমি উপস্থিত থাকবে।
প্রতিদিন থাকতে হবে না। মাঝে
মাঝে আমি থাকব।

তাদের মধ্যে কোনো ঘটনা কি
ঘটেছে?

জানি না। ঘটতে পারে। সাবধান
থাকা ভালো। তুমি টেবিলের নিচে
তাদের পায়ের দিকে লক্ষ রাখবে।
পারে পারে চৌকঠুকি দেখলেই
বুঝবে ঘটনা ঘটেছে। এরকম কিছু
চোখে পড়লে মাষ্টারকে কানে ধরে
বিদায় করব। বদ কোথাকার!

অবস্থি ছাদে হাঁটছে, তবে বৃষ্টিতে
ভিজছে না। তার গায়ে নীল রঙের
রেইনকোট। এই রেইনকোট তার মা
ইসাবেলা পেন থেকে গত বছর
পাঠিয়েছিলেন। জন্মদিনের উপহার।
এ বছরের জন্মদিনের উপহার এখনো
এসে পৌঁছায় নি। তবে জন্মদিন
উপলক্ষে লেখা চিঠি এসে পৌঁছেছে।
অবস্থি সেই চিঠি এখনো পড়ে নি।
রাতে ঘুমুতে যাওয়ার সময় পড়বে।
ইসাবেলা তার মেয়েকে বছরে দুটা
চিঠি পাঠান। একটা তার জন্মদিনে,
আরেকটা খ্রিসমাসে।

অবস্থিদের ছাদ ঝোঁপঝাড়
বোঝাই এক জংলি জায়গা। তার
দাদি জীবিত থাকা অবস্থায় ছাদে বড়
বড় টব তুলে নানান গাছপালা
লাগিয়েছিলেন। তিনি নিয়মিত ছাদে
আসতেন, গাছগুলির যত্ন নিতেন।
তার মৃত্যুর পর অবস্থি ছাদে আসে।
কিছু টবের গাছে পানি দেয় না।
গাছগুলি নিজের মতো বড় হয়েছে।
কিছু মরে গেছে। কিছু টবে আগাছা
জন্মেছে। একটা কামিনীগাছ হয়েছে
বিশাল। বর্ষায় ফুল ফোটে। সেই গন্ধ
তীব্র। আজ অবশি কামিনী ফুলের
গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি হতে
পারে কিছু বিশেষ দিনে কামিনী ফুল
গন্ধ দেয় না!

ছাদের রেলিংয়ের একটা অংশ
ভাঙা। অবস্থি মাঝে মাঝেই
রেলিংয়ের ভাঙা অংশে দাঁড়ায়। সে
ঠিক করে রেখেছে, কোনো একদিন
সে এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দেবে।
ঝাঁপ দিয়ে যেখানে পড়বে সে
জায়গাটা বাধানো। কাজেই তার
মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। আজ সে ঝাঁপ

দেবে না বলেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে
থেকে নিচে নেমে এল। রহিমা বলল,
আপনের দাদা ডাকে। মনে হয়
কোনো জটিল কথা বলবে।

অবস্থি তার দাদাজানের সামনে
দাঁড়িয়ে বলল, দাদাজান জটিল কিছু
বলবে?

সরফরাজ নাতনির দিকে তাকিয়ে
ধবল দুঃখবোধে আপ্ত হলে।
মেয়েটা পৃথিবীর সব রূপ নিয়ে চলে
এসেছে। অতি রূপবতীদের কপালে
দুঃখ ছাড়া কিছু থাকে না। তিনি
দীর্ঘনিশ্বাস চাপতে চাপতে বললেন,
হুঁ, বলব।

উপদেশমূলক কথা? জন্মদিনে
উপদেশমূলক কথা শুনতে ভালো
লাগে না।

কী ধরনের কথা শুনতে ভালো
লাগে?

মজার কোনো কথা।

সরফরাজ বিরক্ত গলায় বললেন,
আমি তো মজার কোনো কথা জানি
না।

অবস্থি বলল, আমি জানি। আমি
বলি তুমি শোন—

আমার মার নাম পেনের রানী
ইসাবেলার নামে। রানী ইসাবেলা
সারা জীবনে দু'বার মাত্র স্নান
করেছেন।

সরফরাজ বললেন, এটা তো
মজার গল্প না। নোংরা ধাকার গল্প।

অবস্থি বলল, রানী ইসাবেলা
যখন দরবারে যেতেন তখন পোশাক
পরতেন। বাকি সময় নগ্ন ঘোরাকেরা
করতেন। গায়ে কাপড় লাগলে গা
কুটকুট করত এই জন্যে।

সরফরাজ হতভম্ব গলায় বললেন,
এই গল্প তোমাকে কে বলেছে?
মাষ্টার?

উনি এই গল্প কেন করবেন? মা
চিঠিতে লিখেছেন। মা চিঠিতে মজার
কথা লেখেন।

সরফরাজ কঠিন গলায় বললেন,
যে চিঠিতে এই গল্প আছে সেই চিঠি
আমাকে পড়তে দিবে।

কেন?

আমার ধারণা কোনো চিঠিতে
এমন কথা তোমার মা লিখে নাই।
এই নোংরা গল্প অন্য কেউ তোমার
সঙ্গে করেছে। বুঝেছ?

অবস্থি হাসল।

সরফরাজ বললেন, হাসছ কেন?
তোমার এই গল্প আমি সিরিয়াসলি
নিয়ছি।

অবস্থি বলল, তুমি সবকিছুই

সিরিয়াসলি নাও। আমার বিষয়ে
তোমাকে এত ভাবতে হবে না।
তোমার বিষয়ে কে ভাববে?

অবস্থির জবাব দেওয়ার আগেই
দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।
নিমন্ত্রিত অতিথিদের কেউ মনে হয়
এসেছেন।

প্রথম অতিথির নাম খালেদ
মোশাররফ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ
মোশাররফ। অবস্থির বাবার বন্ধু।

অবস্থি মা! কেমন আছ?

ভালো আছি চাকু।

আজ তোমাকে অন্য দিনের চেয়ে
একটু কম সুন্দর লাগছে। এর কারণ
কী মা?

চাকু! আপনি যখনই আসেন এই
কথা বলেন।

খালেদ মোশাররফ বললেন,
আমি মিলিটারি মানুষ। যা দেখি তাই
বলি। আমি তো বানিয়ে বানিয়ে
বলতে পারি, অবস্থিকে আজ পরীর
মতো সুন্দর লাগছে।

মিলিটারিরা কি সবসময় সত্যি
কথা বলে?

না রে মা। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে
তখন অবশ্যই বলে। যুদ্ধের সময়
মিথ্যা বলার সুযোগ থাকে না।

সরফরাজ ভেতর থেকে বললেন,
কে এসেছে? খালেদ!

অবস্থি বলল, হ্যাঁ দাদাজান।
জন্মদিনের পার্টি এখন শুরু হলো।

শফিক তার কিগাতলার বাসার
বারান্দায় কেরোসিনের চুলায় ভাত
বসিয়েছে। দুপুরের ডাল রসে গেছে।
রাতে ডালের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাজা করা
হবে। ডাল থেকে টক গন্ধ আসছে।
গরমে নষ্ট হয়ে যাওয়ারই কথা।
শফিক ঠিক করল এখন থেকে বাড়তি
কিছু রান্না হবে না। যতটুকু ধরোজন
ততটুকুই রাখবে।

বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না।
বাংলাদেশের মানুষ একবেলা রুটি
খাচ্ছে। শফিক রুটি খেতে পারে না।
রুটি বানানোও ঝামেলা। আটা দিয়ে
কাই বানানো, বেগুন দিয়ে রুটি বেলো,
তাওয়ায় সেকো। মেলা দিগদারি।

সবচেয়ে ভালো হয় রাখানাথ
বাবুর মতো একবেলা খাওয়ার অভ্যাস
করলে। তিনি সূর্যডোবার পরপর
একবেলা খান। তাতে যদি তাঁর
সমস্যা না হয় শফিকের কেন হবে!
রাখানাথ বাবু এখন একটা বই
লিখছেন—রবীন্দ্রনাথ এবং বৌদ্ধ ধর্ম।
তাঁর নানান রকম অজুত অজুত তথ্য



দরকার হয়। শফিকের উপর দায়িত্ব পড়ে তথা অনুসন্ধানের উপর। শফিককে তিনি মাগনা খাটান না। প্রতিটি তথ্যের জন্যে কুড়ি টাকা করে দেন। রাধানাথ বাবুর কাছে শফিকের চল্লিশ টাকা পাওনা হয়েছে। রাধানাথ বাবু বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কোনো এক জায়গায় জীবন এবং মৃত্যুকে রমণীর দুই স্তন হিসেবে ভেবেছেন। আমার কিছুই মনে পড়ছে না। তুমি খুঁজে বের করতে পারলে চল্লিশ টাকা দেব। রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পড়া শুরু করো।

শফিক আজই খুঁজে পেয়েছে। কাল সকালে যাবে, টাকাটা নিয়ে আসবে। তার হাত একেবারেই খালি।

কবিতার লাইন দুটি আছে নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে। কবিতার নাম 'মৃত্যু'।

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে
শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে
স্তনান্তরে।

ভাত হয়ে গেছে। ডিম ভাজা গেল না। একটাই ডিম ছিল, সেটা পচা বের হয়েছে। শফিক টকে যাওয়া ভাল দিয়ে খেতে বসল। কয়েক নলার বেশি খাওয়া গেল না। শরীর উন্টে আসছে। আজকের ডালমাখা ভাত অবশ্যি নষ্ট হবে না। বিশাল কুকুরটা তার পেছনে পেছনে এসে মেঝেতে থালা গেড়ে বসে আছে। সে নিশ্চয় ক্ষুধার্ত। এত বড় শরীরের জন্যে প্রচুর খাদ্য দরকার।

শফিক ডাল মাখানো ভাত উঠানে ঢেলে দিল। কী আগ্রহ করেই না কুকুরটা খাচ্ছে। ঘরে একটা টিনের থালা থাকলে থালায় ভাত দেওয়া যেত। পশুপাখিরাও তো কিছুটা সম্মান আশা করতে পারে। শফিক বলল,

এই তোর নাম কী?

কুকুরটা মাথা তুলে তাকিয়ে আবার খাওয়ার মন দিল।

শফিক বলল, আমি তোর নাম দিলাম কালাপাহাড়। নাম পছন্দ হয়েছে?

কুকুর এইবার ঘেউ শব্দ করল।

শফিক বলল, খাওয়াদাওয়া করে চলে যা। আমি খুবই গরিব মানুষ। ডালটা নষ্ট না হলে আমিই খেতাম। তোকে দিতাম না। আমার পজিশন তোর চেয়ে খুব যে উপরে তা কিছু না।

কালাপাহাড় আরেকবার ঘেউ করে শুয়ে পড়ল। তার ডিনার শেষ হয়েছে। ঋতুভ্রাতির রাতে সে আর বের হবে না। এখানেই থাকবে।

অবস্থা মায়ের চিঠি নিয়ে শুয়েছে। খাম খুলেই সে প্রথমে গন্ধ ভুলল। তার মা চিঠিতে দু'ফোঁটা পারফিউম দিয়ে খাম বন্ধ করেন। গন্ধের খানিকটা থেকে যায়।

আজকের গন্ধটা অদ্ভুত। চা-পাতা চা-পাতা গন্ধ। মার কাছ থেকে এই পারফিউমের নাম জানতে হবে। অবস্থা চিঠি পড়তে শুরু করল—

শুভ জন্মদিন অবস্থি মা,

তুমি তোমার যে ছবি পাঠিয়েছ, এই মুহূর্তে তা আমার লেখার টেবিলে। আমি প্রবল ঈর্ষা নিয়ে ছবিটির দিকে তাকাতে তাকাতে তোমাকে লিখছি। তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হয়ে পৃথিবীতে এসেছ। তোমার মতো বয়সে সবাই আমাকে ভাকত 'Flower'। তোমার নাম আমি দিলাম 'স্বর্গের পুষ্প'। একটাই ত্রুটি—তোমার চোখ আমার চোখের মতো নীল হয় নি। তুমি তোমার বাবার

কালো চোখ পেয়েছ। ভালো কথা, তোমার বাবার সঙ্গে কি তোমার কোনো যোগাযোগ হয়েছে? আশ্চর্যের ব্যাপার, মানুষটা কি শেষ পর্যন্ত হারিয়েই গেল?

তুমি চিঠিতে তোমার এক গৃহশিক্ষকের কথা লিখেছ। তুমি কি এই যুবকের প্রেমে পড়েছ? চট করে কারও প্রেমে পড়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা না। অতি রূপবতীদের কারও প্রেমে পড়তে নেই। অন্যরা তাদের প্রেমে পড়বে, তা-ই নিয়ম।

এখন আমি তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চাচ্ছি। তুমি কি আসবে আমার এখানে?

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি হতদরিদ্র দেশে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। তোমার বৃদ্ধ দাদাজনকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য দেশে পড়ে থাকতে হবে—এটা কোনো কাজের কথা না। তোমার জীবন তোমার একারই। এক বৃদ্ধকে সেখানে জড়ানোর কিছু নেই।

লুইসের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এখন আমি একা বাস করছি। লুইসের কারণে আমি অনেক টাকার মালিক হয়েছি। ঠিক করেছি সমুদ্রের কাছে একটা ভিলা কিনে বাস করব। তুমি আমার সঙ্গে এসে থাকতে পারো। মা-মেয়ে সুখে জীবন পার করে দেব।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে পারফিউমের একটা সেট পাঠালাম। তোমার ষোল বছর হয়েছে বলে ষোলটা

পারফিউম। এর মধ্যে তোমার কাছে সবচেয়ে ভালোটির নাম আমাকে লিখে পাঠাবে। যদি আমার পছন্দের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে পুরস্কার আছে।
মা তুমি ভালো থেকো।

ইসাবেলা

মেঘ কেটে আকাশে চাঁদ উঠেছে। ভাদ্রমাসে চাঁদের আলো সবচেয়ে প্রবল হয়। চারদিকে পানি জমে থাকে বলে চাঁদের আলো প্রতিকলিত হয়ে ভাদ্রের চন্দ্র-রাত আলোময় হয়।

শফিক বারান্দায় কাঠের বেঞ্চে বসে আছে। বৃষ্টিভেজা উঠান চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। এই রূপ শফিককে স্পর্শ করছে এরকম মনে হচ্ছে না। সে ক্ষুধার অস্থির। ক্ষুধার সময় দেবতা সামনে এসে দাঁড়ালে তাকেও নাকি খাদ্যদ্রব্য মনে হয়।

কালো কুকুরটা এখনো আছে। শফিক বেঞ্চে বসামাত্র সে উঠে এসে বেঞ্চের নিচে ঢুকে পড়ল। এক থালা টকে যাওয়া ডালমাখা ভাত খেয়ে সে কৃতজ্ঞতার অস্থির হয়ে আছে।

শফিক ভাকল, কালাপাহাড়! এই কালাপাহাড়!

কালাপাহাড় সাড়া দিল। বেঞ্চের নিচ থেকে মাথা বের করে তাকাল শফিকের দিকে। শফিক বলল, কুকুর হয়ে জন্মানোর একটা সুবিধা আছে। খুব ক্ষুধার্ত হলে ডাউটবিন ঘাটাঘাটি করলে কিছু-না-কিছু পাওয়া যায়। মানুষের এই সুবিধা নেই।

কালাপাহাড় বিচির শব্দ করল। শফিকের কেন জানি মনে হলো কুকুরটা তার কথা বুঝতে পেরে জবাব দিয়েছে। শফিকের হঠাৎ করেই গায়ে কাঁটা দিল।

রাধানাথ বাবুর বয়স পঁয়ষাট। তাঁর মাথাভর্তি ধবধবে সাদা চুলের দিকে তাকালেই শুধু বয়স বোঝা যায়। সবল সুঠাম বেটেখাটো মানুষ। চোখ বড় বড় বলে মনে হয় তিনি সারাক্ষণ বিম্বিত হয়ে আছেন। তার গাত্রবর্ণ অস্বাভাবিক গৌর। তাঁর মাসি বলতেন, আমার রাধুর গা থেকে আলো বের হয়। রাতেরবেলা এই আলোতে তুলসি দাসের রামায়ণ পড়া যায়।

চিরকুমার এই মানুষটি নীলক্ষেতের একটা দোতলা বাড়ির চিলেকোঠায় থাকেন। একতলায় তাঁর প্রেস। প্রেসের নাম 'আদর্শলিপি'। প্রেসের সঙ্গে জিংক রকের একটা ছোট্ট কারখানাও আছে। প্রেসের লোকজন তাঁকে ডাকেন সাধুবাবা। সাধুবাবা ডাকার যৌক্তিক কারণ আছে। তাঁর আচার-আচরণ, জীবনযাপন পদ্ধতি সাধুসন্তদের মতো।

বাড়ির চিলেকোঠায় তাঁর প্রার্থনার ব্যবস্থা। পশমের আসনে বসে চোখ বন্ধ করে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনায় বসেন। তাঁর সামনে থাকে ভূমিকালির একটা বাঁধানো পায়ের ছাপ। এই ছাপটা কার পায়ের তা তিনি কাউকে এখনো বলেন নি। প্রার্থনার সময় পায়ের ছাপের সামনে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলে। ধূপ পোড়ানো হয়। কোনো কোনো দিন প্রার্থনা দ্রুত শেষ হয়, আবার দীর্ঘসময় নিয়েও প্রার্থনা চলে।

সাধুবাবা রাধানাথ গুচিবামুগ্ধ না, কিন্তু তিনি মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেন। তাঁর পরিচিত সবাই বিষয়টি জানে বলে খুব সাবধানে থাকে। দৈবাৎ কারও গায়ের সঙ্গে গা লেগে গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্নান করেন। স্নানের পর ভেজা কাপড় বদলান না। ভেজা কাপড় গায়ে শুকান।

তিনি নিরামিষাশি এবং একহারি। সূর্য ডোবার আগে আগে খাবার খান, তবে সারা দিনই ঘনঘন চা খান, লেবুর শরবত খান।

রাধানাথ বাবুর সামনে দৈনিক ইষ্টেকাক হাতে শফিক বসে আছে। সে এই বাড়িতে প্রতিদিন সকাল নটার মধ্যে এসে পড়ে। তার দুটি দারিত্বের একটি রাধানাথ বাবুকে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো এবং তাঁর ডিকটেশন নেওয়া। কিছুদিন হলো রাধানাথ বাবুর চোখের সমস্যা হচ্ছে। পড়তে গেলে বা লিখতে গেলে চোখ কড়কড় করে। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। তিনি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। ডাক্তার বলেছে চোখের পাতায় খুশকি হয়েছে। চিরকাল তিনি জেনেছেন খুশকি মাথায় হয়। খুশকি যে চোখের পাতায়ও হয় তা তাঁর জানা ছিল না। জগতের কত কিছুই যে তিনি জানেন না তা ভেবে সেদিন তিনি বিম্বিত হয়েছিলেন।

শফিক বলল, আগে কি হেডলাইনগুলি পড়ব?

রাধানাথ বললেন, পত্রিকায় সবচেয়ে ভালো খবর আজ কী ছাপা হয়েছে সেটা পড়ো। এরপর পড়বে সবচেয়ে খারাপ খবর। ভালো এবং মন্দে কাটাকাটি হয়ে যাবে।

শফিক বলল, ভালো খবর তেমন কিছু পাচ্ছি না।

রাধানাথ বললেন, একটা জাতীয় দৈনিকে ভালো কোনো খবর ছাপা হবে না তা হয় না। ভালোমতো খুঁজে দেখো, নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু আছে। রিকশাওয়ালা সততা, মানিবাগ কুড়িয়ে পেয়ে ফেরত দিয়েছে টাইপ কিছু থাকার কথা।

শফিক বলল, একটা পেয়েছি। লবণের দাম কিছু কমেছে। আগে ছিল যাট টাকা কেজি, এখন হয়েছে পঞ্চাশ টাকা কেজি। সরকার স্থলপথে ইতিয়া থেকে লবণ আমদানির নির্দেশ দিয়েছেন।

রাধানাথ বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি তো খুবই খারাপ একটা খবর পড়লে। কক্সবাজার ভর্তি সামুদ্রিক লবণ। অথচ লবণ আনতে হচ্ছে ইতিয়া থেকে। হোয়াট এ শেম! এখন ভালো খবরটা পড়ো।



শফিক বলল, দুটা একশ টাকার নোটের ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়েছে। নোট দুটার নম্বর এক। খবরে বলেছে, বাংলাদেশের কারেন্সি ইন্ডিয়া ছেপে দেয়। ধারণা করা হচ্ছে তারা দুই সেট কারেন্সি ছাপে। এক সেট বাংলাদেশকে দেয়, অন্য সেট তারা বাংলাদেশী পণ্য নেওয়ার জন্য ব্যবহার করে।

রাধানাথ বললেন, এটা তো খুবই ভালো খবর।

ভালো খবর ?

অবশ্যই ভালো খবর। বাংলাদেশ সরকার গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে। ইন্ডিয়ান প্রতি নির্ভরতা কমাবে।

শফিক বলল, আপনার যুক্তি অদ্ভুত, কিন্তু ভালো।

রাধানাথ বললেন, যুক্তিবিদ্যা অতি দুর্বল বিদ্যা, সবদিকে এই বিদ্যা খাটানো যায়। যাই হোক, তুমি চলে যাও আজ আমি ডিকটেশন দেব না।

আপনার কি শরীর খারাপ ?

হঁ। চোখের যন্ত্রণা বাড়ছে। মনে হয় অন্ধ হওয়ার পথে এগুচ্ছি। এটা ভালো।

কীভাবে ভালো ?

জগতের রূপ দেখতে হয় চোখ বন্ধ করে। হাসন রাজা তাই বলেছেন, “আঁখি মুজিয়া দেখো রূপ রে।” জগতের রূপ দেখার জন্য তৈরি হচ্ছে, খারাপ কী ? দ্রয়ারটা খোল।

শফিক দ্রয়ার খুলল।

রাধানাথ ক্লান্ত গলায় বলল, তোমার চম্পিশ টাকা পাওনা হয়েছে। পঞ্চাশ টাকার নোটটা নিয়ে যাও। দশ টাকা পরে ফেরত দিয়ে। ডিসিবির একটা রসিদ আছে দেখো। রসিদে হয় শার্টের জন্য আড়াই গজ কাপড় দিবে নয়তো প্যান্টপিস দেবে। রসিদ দেখিয়ে তোমার যেটা প্রয়োজন নিয়ে নিয়ে। এখন বলো, মানুষের সবচেয়ে কঠিন অভাব কোনটা ?

খাদ্যের অভাব।

হয় নাই। বস্ত্রের অভাব। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তুমি বের হতে পারবে। ভিক্ষা চাইতে পারবে। নগ্ন অবস্থায় সেটা পারবে না। তোমাকে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হবে।

শফিক বলল, আপনার চোখ দিয়ে পানি

পড়ছে।

রাধানাথ বললেন, দেখে কি মনে হচ্ছে না গভীর দুঃখে আমি কান্দছি ?

মনে হচ্ছে।

রাধানাথ আর্থহের সঙ্গে বললেন, ধর্মপাশার একজন সাধুর নাম অশ্রুবাবা। তিনি ভক্তদের দেখলেই চোখের পানি ফেলতেন। অশ্রুবাবার নামডাক শুনে একবার তাকে দেখতে গেলাম। তিনি দু’হাতে আমার ডানহাত জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। আমি আবিষ্কার করলাম, তাঁর চোখের কোনো সমস্যার কারণে তিনি অশ্রুবর্ষণ করেন। ভক্তের দুঃখে আপ্ত হয়ে বা তার প্রতি মমতাবশত অশ্রুবর্ষণ করেন না। তাঁর হাতটা আমার দেখার শখ ছিল। আমি বললাম, বাবা, আপনার হাতটা একটু দেখি। আমি একজন শখের হস্তরেখাবিদ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত মুঠো করে চোখমুখ শক্ত করে ফেললেন। অশ্রুবাবা এরকম কেন করলেন জানো ?

না।

তিনি নিশ্চয়ই বড় কোনো পাপ করেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল আমি হাত দেখে সেটা ধরে ফেলব।

শফিক বলল, আপনি আমার হাতটা একদিন দেখে দেবেন না ?

রাধানাথ বললেন, না। হাতের রেখায় মানুষের ভাগ্য থাকে না। মানুষের ভাগ্য থাকে কর্মে।

তোমার কর্ম তো আমি দেখছি।

শফিক বলল, হাতের রেখা বিশ্বাস করেন না তাহলে হাত দেখেন কেন ?

রাধানাথ বললেন, পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ ভুলের পেছনে কেন ছুটেছে কেন এই বিদ্যার চর্চা এখনো হচ্ছে তা জানার জন্যে। এখন তুমি বিদায় হও। আজ একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আজকের কথা বলার কোটা শেষ। আজ আর কথা বলব না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকব।

‘অতিভুক্তিরতী বোত্রিঃ

সদ্যঃপ্রাণাপহারিণী’

এর অর্থ—অতিরিক্ত ভোজন এবং অতিরিক্ত বাচালতা সদ্য প্রাণনাশক।

রাধানাথ বাবু দরজা-জানালা বন্ধ করে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। তিনি চিলেকোঠায় মেঝেতে পাতা শীতলপাটিতে ঘুমান। এই ঘরে কখনো না। এটা অতিথি-অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ঘর। দেয়ালে যামিনী রায়ের দুটি দুর্লভ ছবি আছে। দুই ছবির মাঝখানে রামকিংকর বেইজের ড্রয়িং। ছবিগুলি যত্নে আছে তা না। যামিনী রায়ের ছক খুলে গেছে বলে তিনি ফাঁস নেওয়ার মতো দেয়ালে ঝুলছেন।

রাধানাথ সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমালেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলেন, তাকে একটা প্রকাণ্ড কাঠালগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। গাছভর্তি বিষ পিপড়া। অর্ধেকটা লাল অর্ধেকটা কালো। বিষ পিপড়ারা তাকে কামড়াচ্ছে। হাত-পা বাঁধা বলে তিনি গা থেকে পিপড়া তাড়াতে পারছেন না। আশপাশে কেউ নেই যে তিনি সাহায্যের জন্যে ডাকবেন।

এই স্বপ্নটা তিনি এর আগেও কয়েকবার দেখেছেন। প্রতিবার স্বপ্নেই কিছু পার্থক্য থাকে কিন্তু মূল বিষয় এক। তিনি গাছের সঙ্গে বাঁধা। পিপড়া তাকে কামড়াচ্ছে। এই স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা কি আছে ? কেউ তাকে কোনো বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাচ্ছে ? সেই কেউটা কে ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি পিতা ? সেই আদি পিতাকে কে সৃষ্টি করেছে ? তিনি স্বয়ং। নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। সেটা কী করে সম্ভব !

রাধানাথ ভ্রুকুঁচকে বসে আছেন। আজ আর চিলেকোঠার প্রার্থনাঘরে যাওয়া হবে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহজনক কোনো চিন্তা মাথায় এলে তিনি অস্থির বোধ করেন। সেদিন আর তাঁর প্রার্থনাঘরে যাওয়া হয় না। এক-দু’দিন সময় লাগে মন ঠিক করতে। মন ঠিক হওয়ার পর জীবনযাপন স্বাভাবিক হয়ে আসে।

দরজা খুলে প্রেসের পিওন মাথা বের করল। তার চোখে ভয়। সাধুবাবার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন পড়লে সে কোনো কারণ ছাড়াই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে।

কিছু বলবি ফণি ?

বাবু চা দিব ?

না।

আপনার কি শরীর খারাপ ?

না।



আপনার কাছে একজন ভদ্রলোক আসছে। এক ঘণ্টার উপরে হইল বইসা আছে। আপনার সঙ্গে নাকি বিশেষ প্রয়োজন। আমি কী বলব আপনি ঘুমে আছেন?

আমি তো ঘুমাচ্ছি না। মিথ্যা বলি কেন?
ঘরে বাতি জ্বালা। ভদ্রলোককে এখানে নিয়ে আর।

বাবু, আপনাকে কি লেবুর শরবত বানায় দিব?

আচ্ছা দে।

ভদ্রলোকের পরনে পায়জামা-পাজ্জবি। পায়ে চপ্পল। অত্যন্ত সুপুরুষ। এই সন্ধ্যাবেলাতেও তার চোখে কালো চশমা। রাধানাথের বিছানার কাছে রাখা কাঠের চেয়ারে তিনি মোটামুটি শক্ত হয়ে বসে আছেন। চেয়ারের হাতলে হাত রাখা, সেই হাতও শক্ত। রাধানাথ বললেন, আমার কাছে কী প্রয়োজন?

ভদ্রলোক ইতস্তত করে বললেন, ওনেছি আপনি খুব ভালো হাত দেখেন। আমি আপনাকে হাত দেখাতে এসেছি।

রাধানাথ বললেন, আমি নিজের শাখে মাঝে মাঝে হাত দেখি। অন্যের শাখে দেখি না।

ভদ্রলোক ছোট নিঃশ্বাস ফেললেন। রাধানাথ বললেন, হাত দেখার এই অপবিজ্ঞানে আমার কোনো আস্থা নেই। দুর্বল মানুষ এর পেছনে ছোটো। আপনি দুর্বল হবেন কেন?

ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার জন্য সামান্য কিছু উপহার এনেছি। দার্জিলিংয়ের চায়ের দুটা প্যাকেট। আপনি উপহার গ্রহণ করলে আমি খুশি হব।

রাধানাথ বললেন, আমি উপহার গ্রহণ করলাম, কিন্তু আপনার হাত দেখব না। প্রেসে ফণি বলে এক কর্মচারী আছে, তার কাছে চায়ের প্যাকেট দিয়ে যান।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত গলায় বললেন, স্যার, তাহলে যাই। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য লজ্জিত।

রাধানাথ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, বসুন। দু'হাত মেলুন। তার আগে আমার টেবিলের ড্রয়ারে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে সেটা আমাকে দিন।

স্যার আপনাকে ধন্যবাদ।

ছাদ থেকে ঝুলন্ত চল্লিশ ওয়াট বাস্তের আলো রাধানাথের জন্যে যথেষ্ট না। রাধানাথ ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতে ঝুঁকে আছেন। তাঁর চোখও সমস্যা করছে। কুমালে বারবার চোখ মুছতে হচ্ছে।

আপনার নাম কী?

ভদ্রলোক নড়েচড়ে বসলেন। জবাব দিলেন না। রাধানাথ বললেন, নাম বলতে কি সমস্যা আছে? সমস্যা থাকলে বলতে হবে না। নামে কিছু আসে যায় না। আসে যায় কর্মে। যিওখিষ্টকে যিওখিষ্ট ডাকলেও তাঁর যিওখি কিছুমাত্র কমবে না।

আমার নাম ফরিদ।

রাধানাথ ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আসল নাম গোপন করলেন তাই না? ফরিদ নামেও চলেবে। আপনি সেনাবাহিনীতে আছেন? আপনার হাতভাব, চোখের কালো চশমায়া এরকম মনে হচ্ছে। হাতে কিছু লেখা নেই।

আমি সেনাবাহিনীতে ছিলাম, এখন নেই।

মুন্ডিয়ুক্ষে অংশ নিয়েছিলেন?

হঁ।

খেতাবধারী?

হঁ।

কতক্ষণ আর হঁ হঁ করবেন? দু'একটা কথা বলুন ওনি। কী খেতাব পেয়েছেন? হাত দেখে মনে হচ্ছে বড় খেতাব। বীরউত্তম নাকি?

হঁ।

আপনার অপঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল। কানিসিতে মৃত্যু। বিশেষ আর কিছু জানতে চাইলে কুণ্ডি তৈরি করতে হবে। চা খাবেন?

না।

আপনি সাহসী, একরোখা, জেদি এবং নির্বোধ। আপনার সুবিধা হচ্ছে, নিজের নির্বুদ্ধিতার বিষয়ে আপনি জানেন অনারা জানে না। যদি সম্ভব হয় একটা রত্ন ধারণ করবেন। রত্নের নাম গোমেদ, ইংরেজিতে বলে গান্টেট। দশ রত্নের মতো হলেই চলেবে।

আপনার এখানে পাওয়া যায়?

না। আমি রত্ন ব্যবসা করি না।

রত্ন কোথায় পাওয়া যাবে?

ঢাকায় পাবেন না, কলকাতা থেকে সংগ্রহ করলে ভালো হয়।

রাধানাথের চোখের যন্ত্রণা হঠাৎ অনেকখানি বাড়ল। তিনি কুমালে চোখ ঢাকতে ঢাকতে বললেন, আপনি কি বিশেষ কিছু জানতে চান?

যুবক ইতস্তত করে বললেন, মানুষের ভাগ্য কি পূর্বনির্ধারিত?

রাধানাথ বললেন, এই জটিল প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ অনুসারে পূর্বনির্ধারিত। সূরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ বলছেন, আমি তোমাদের ভাগ্য তোমাদের গলায় নেকলেসের

মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি। ইহা আমার পক্ষে সম্ভব।

আপনি কোরান শরীফ পড়েছেন?

অনুবাদ পড়েছি।

আগন্তুক বলল, আপনার দেয়ালে অতি মূল্যবান কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি।

রাধানাথ বললেন, এই পৃথিবীতে মূল্যবান শুধু মানুষের জীবন, আর সবই মূল্যহীন।

আগন্তুক দার্শনিক কথাবার্তার দিকে না গিয়ে বলল, ছবিগুলি অবশ্যে আছে। ধূলা মাকড়শার ঝুল। আমি কি আপনার প্রেসের ছেলে ফণিকে বলে ঠিক করে দিয়ে যাব?

না।

আপনার কাছে নাম গোপন করেছিলাম বলে দুঃখিত। আমার নাম শরিফুল হক। আচ্ছা জনাব যাই।

রাধানাথ কোনো কারণ ছাড়াই খানিকটা অস্থির বোধ করলেন। যুবক কি তার নিজের অস্থিরতা খানিকটা তাকে দিয়েছে? এই সম্ভাবনা আছে। মানুষ চুককের মতো। একটি চুকক যেমন পাশের চুকককে প্রভাবিত করে, মানুষও করে।

শরিফুল হকের ডাকনাম ডালিম। মেজর ডালিম। এই নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত।

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। শুক্রবার। ভোরবেলা রেডিও বাংলাদেশ থেকে ডালিমের কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল। এই যুবক আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেছিল, “আমি মেজর ডালিম বলছি। স্বৈরাচারী মুজিব সরকারকে এক সেনাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে। সারাদেশে মার্শাল ল’ জারি করা হলো।”

এই প্রসঙ্গ আপাতত থাক। যথাসময়ে বলা হবে। দুঃখদিনের গাথা একসঙ্গে বলতে নেই। ধীরে ধীরে বলতে হয়।

রাত আটটা।

শফিক অবস্তির পড়ার ঘরে বসে আছে। তাকে চা দেওয়া হয়েছে, সে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে। অবস্তি এখনো আসে নি। তার দাদা সরফরাজ খান একটা বই হাতে বেতের চেয়ারে বসে আছেন। শফিক কখনো তাকে অবস্তির পড়ার ঘরে দেখে নি।

সরফরাজ বললেন, মাষ্টার, তোমার ছাত্রীর পড়াশোনা কেমন চলছে?

শফিক বলল, ভালো।

সরফরাজ বললেন, গৃহশিক্ষক বিষয়টাই আমার অপছন্দ। আইন করে গৃহশিক্ষকতা উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কেন জানো?

জি-না।

ছাত্রছাত্রীরা গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নিজেরা কিছু বুঝতে চায় না। কষ্ট করতে চায় না। আমার কথায় যুক্তি আছে না?

জি আছে।

সরফরাজ বললেন, নৈতিকতার বিষয়ও আছে। ছাত্রীরা প্রেম শেখে গৃহশিক্ষকের কাছে। তোমাকে কিছু বলছি না। তুমি আবার কিছু মনে করো না। আমি ইন জেনারেল বলছি। গৃহশিক্ষক এবং ছাত্রীর প্রেম কোথায় শুরু হয় জানো?

শফিক অবস্থির সঙ্গে বলল, না।
শুধু হয় টেবিলের তলায় পায়ে পায়ে ঠুকঠুকি
থেকে। তারপর বই লেনদেন। বইয়ের পাতার
ভেতরে চিঠি।

সরফরাজ হয়তো আরও কিছু বলতেন তার
আগেই অবস্থি চুকল। সে অবাক হয়ে বলল,
দাদাজান, তুমি এখানে কেন?

সরফরাজ বললেন, আমি এখানে থাকতে
পারব না?

না। তুমি থাকবে তোমার ঘরে।

মাস্টার তাকে কীভাবে পড়ায় দেখি।
একেকজনের পড়ানোর টেকনিক একেক রকম।
শফিকের টেকনিকটা কী জানা দরকার।

অবস্থি বলল, কোনো দরকার নেই। তাছাড়া
আজ আমি পড়ব না। স্যারের সঙ্গে গল্প করব।
গল্প করবি?

সবদিনি পড়তে ভালো লাগে না। তখন গল্প
করতে হয়।

সরফরাজ বললেন, কী গল্প করবি আমিও
শুন। শ্রোতা যতই ভালো হয় গল্প ততই জমে।

অবস্থি বলল, দাদাজান, আমি একেকজনের
সঙ্গে একেক ধরনের গল্প করি। তুমি উঠ তো।

সরফরাজ উঠে দাঁড়ালেন। অবস্থি বলল,
যাওয়ার সময় দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে যাবে এবং
অবশ্যই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

সরফরাজ বিড়বিড় করে কিছু বললেন,
পরিষ্কার বোঝা গেল না। অবস্থি শফিকের সামনে
বসতে বসতে বলল, দাদাজানের স্বভাব মাছির
মতো। খুব বিরক্ত করতে পারেন।

শফিক জবাব দিল না। কিছুক্ষণ আগে ঘটে
যাওয়া ঘটনায় সে বিব্রত বোধ করছে। সে তার
দুই পা যথাসম্ভব ভেতরের দিকে টেনে বসেছে।

মনে করার চেষ্টা করছে—কখনো কি অবস্থির
পায়ের সঙ্গে তার পা লেগেছে?

অবস্থি কালো রঙের চামড়ার ব্যাগ নিয়ে
বসেছে। সে ব্যাগ খুলে পারফিউমের শিশি টেবিলে
সাজাচ্ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শফিক।
অবস্থি বলল, স্যার এখানে ফোলটা শিশি আছে।
আপনি প্রতিটি পারফিউমের গন্ধ শুকবেন, তারপর
বলবেন সবচেয়ে সুন্দর গন্ধ কোনটা, সবচেয়ে কম
ভালো গন্ধ কোনটার।

শফিক বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

অবস্থি বলল, আমার মৌলতম জন্মদিন
উপলক্ষে আমার মা ফোলটা পারফিউম
পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন কোনটার গন্ধ
আমার সবচেয়ে ভালো লাগল।

শফিক বলল, উনি নিশ্চয়ই জানতে চান নি
আমার কোনটা ভালো লাগল।

অবস্থি বলল, উনি জানতে চান নি কিন্তু আমি
জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা স্যার আপনি কি জার্মান ভাষা
জানেন?

শফিক বলল, বাংলা ভাষাই ঠিকমতো জানি
না, জার্মান কীভাবে জানব? কেন বলো তো?

অবস্থি বলল, আমি একটা লেখা লিখেছি।
আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা। আমি এই লেখাটা
আমার মা'কে পড়াতে চাই। মা স্প্যানিশ এবং
জার্মান ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না। তিনি
যখন আমাকে চিঠি লেখেন তখন সেই চিঠি
কাউকে দিয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে দেন।
অবশ্য মূল চিঠি সবসময় সঙ্গে থাকে।

শফিক বলল, আমার পরিচিত একজন আছে,
নাম রাধানাথ। তিনি পৃথিবীর অনেক ভাষা জানেন।
বিরাট পণ্ডিত মানুষ। তবে জার্মান ভাষা জানেন কি
না আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নেব।

অবস্থি বলল, চুপ করে বসে থাকবেন
না স্যার, গন্ধ পরীক্ষা শুরু করুন। স্যার
ভালো কথা, আপনি কি বাসি পোলাও খান?
আমার জন্মদিনে একগাদা খাবার রান্না করা
হয়েছে। শুধু একজন গেস্ট এসেছে, আর কেউ
আসে নি। আপনাকে কি টিফিন কেরিয়ারে করে
কিছু খাবার দিয়ে দেব?

শফিক বলল, নাও।

শফিক কাদেরের চায়ের দোকানে বসে। টিফিন
কেরিয়ার ভর্তি খাবার নিয়ে শফিক চায়ের দোকানে
এসেছে। দুজনেই আশ্রয় করে নিরুশ্বাসে আছে।

কালাপাহাড়কেও খাবার দেওয়া হয়েছে। সে
পোলাও খাচ্ছে না। চোখ বন্ধ করে আরামে
মাংসের হাড় চিবাবে। কাদের বলল, ভাইজান,
আপনি আজিও মানুষ।

শফিক বলল, আজিও কেন?

খানা নিয়া আমার এইখানে চইলা আসলেন!
আমি আপনার কে বলেন? কেউ না। ভাইজান,
এত আরাম কইরা অনেকদিন খানা খাই না। আমি
আপনার দেশের বাড়িতে নিয়া যাব। গ্রামের নাম
তালতলি, কেন্দুয়া থানা। আমার স্ত্রী বেগুন দিয়া
টেংরা মাছের একটা সালাদ রাখে। এমন স্বাদের
সালাদ বেহেশতেও নাই। আপনার খাওয়াব।
আমার সাথে দেশের বাড়িতে যাবেন না?

শফিক বলল, যাব।

কাদের বলল, আপনার সঙ্গে আমি ভাই
পাতাইলাম। আইজ থাইকা আপনে আমার
ছোটভাই। আমি খুবই গরিব মানুষ। ভাইয়ে-
ভাইয়ে আবার ধনী-গরিব কী? ঠিক না ছোটভাই?
শফিক হাসল।



অবস্থির লেখা

আমার দাদাজান সরফরাজ খান পুলিশের এসপি হয়ে রিটায়ার করেছিলেন। আমি আমার জীবনে তাঁর মতো ভীতু মানুষ দেখি নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তিনি অসীম সাহসিকতার জন্য ‘পিপিএম’ পেয়েছিলেন। পিপিএম হলো পাকিস্তান পুলিশ মডেল। পুলিশ সার্ভিসে সাহসিকতার সর্বোচ্চ পুরস্কার।

আমি দাদাজানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী জন্যে এত বড় পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন? দাদাজান বললেন, ফরগেট ইট! এই বাক্যটি তাঁর খুব প্রিয়। কারণে-অকারণে তিনি বলেন, ফরগেট ইট! যেসব প্রশ্নের উত্তরে ‘ফরগেট ইট’ কিছুতেই বলা যায় না, সেখানেও তিনি এই বাক্য বলেন। উদাহরণ দেই—

আমি একদিন বললাম, দাদাজান, বাজার থেকে কই মাছ এনেছে। মটরশুটি দিয়ে রান্না করবে নাকি আলু দিয়ে?

দাদাজান বললেন, ফরগেট ইট।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে দাদাজান আমার জন্যে একটা বোরকা কিনে আনলেন। কঠিন বোরকা। বাইরে থেকে চোখও দেখা যায় না এমন। আমাকে বললেন, বোরকা পর। আমি বোরকা পরলাম। দাদাজান বললেন, এখন চল।

আমি বললাম, কোথায় যাব?

সোহাগী যাব। ঢাকা শহরে থাকা যাবে না। এখনই রওনা হব।

সঙ্গে আর কিছু নেব না?

দাদাজান বললেন, ফরগেট ইট।

আমি বললাম, দাঁত মাজার ব্রাশও নেব না?

দাদাজান বললেন, বেঁচে থাকলে দাঁত মাজার অনেক সুযোগ পাবি। বেঁচে থাকবি কি না এটাই এখন প্রশ্ন।

ঢাকা শহর আমরা পার হলাম রিকশায় এবং পায়ে হেঁটে। কিছু কিছু বাস ঢাকা থেকে যাচ্ছিল। ঢাকা ছেড়ে যাওয়া বাসগুলিতে মিলিটারিরা ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছিল। মিলিটারি তল্লাশি মানে কয়েকজনের মৃত্যু। মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া তখনো শুরু হয় নি।

রিকশা ছাড়া আর যেসব যানবাহনে আমি চড়েছি সেগুলি হচ্ছে—মহিষের গাড়ি, মোটরসাইকেল (শিবগঞ্জ থানার ওসি সাহেব মোটরসাইকেল চালিয়েছেন, তাঁর পেছনে দাদাজান এবং আমি বসেছি।) সবশেষে নৌকা। নৌকাও কয়েক ধরনের। এর মধ্যে একটা ছিল বালিটানা নৌকা। এই নৌকায় পাটাতনের নিচে আমাকে দাদাজান লুকিয়ে রাখলেন। যাত্রার পুরো সময়টা তিনি আতঙ্কে অস্থির হয়ে ছিলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন আমরা এক পর্যায়ে মিলিটারির হাতে পড়ব। তারা দাদাজানকে গুলি করে মারবে এবং আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। দাদাজান দিনের মধ্যে অনেকবার অজু করতেন। তিনি চাচ্ছিলেন যেন পবিত্র অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আমরা তিন দিন পর সোহাগী পৌঁছলাম। নদীর পাড়ে দোতলা দালান। বাবার সঙ্গে এই বাড়িতে আগে আমি দু’বার এসেছি।

দাদাজানের এই বাড়ি পুরোনো ধরনের, তবে যথেষ্টই সুন্দর। দোতলায় টানা বারান্দা আছে। ষ্টিমারের ডেকে বসলে যেমন সারাক্ষণ প্রবল হাওয়া গায়ে লাগে, বারান্দায় দাঁড়ালেও তা-ই। সারাক্ষণ হাওয়া বইছে। বাড়ির তিনদিকেই ফলের বাগান। লিচুগাছ থেকে শুরু করে তেঁতুলগাছ সবই সেখানে আছে। দাদাজানের ওই বাড়িতেই আমি জীবনের প্রথম গাছ থেকে নিজ হাতে পেড়ে লিচু খেয়েছি। লিচু মিষ্টি না, টক। লবণ দিয়ে খেতে হয়।



আমাদের বাড়ির সামনের নদীর নাম তরাই। এই নদী ব্রাহ্মপুত্রের শাখা। বর্ষায় পানি হয়। শীতের সময় পায়ের পাতা ভেজার মতো পানি থাকে। সেবার তরাই নদীতে প্রচুর পানি ছিল। জেলেরা সারাদিনই জাল ফেলে মাছ ধরত। তরাই নদীর বোয়াল মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু। জেলেরা ভোরবেলায় মাছ দিয়ে যেত। নানান ধরনের মাছ। রান্না করতেন ধীরেন কাকু। উনি হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে মিলিটারির হাতে মারা যান। দাদার বাড়ির আশপাশে প্রচুর আত্মীয়স্বজন থাকার কথা। তা ছিল না। কারণ দাদাজানের বাবা (জাঙ্গির মুন্সি) পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে এই বাড়ি করেছিলেন। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাঁর উপায় ছিল না। তিনি তাঁর বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। ওই মহিলার ছবি আমি দেখেছি। তিনি ছিলেন কদাকার। উঁচু হনু। দাঁত বের হওয়া। গায়ের রঙ পাতিলের তলার মতো কালো। কী দেখে তিনি এই মহিলার ধেমে পড়েছিলেন তা এখন আর জানার উপায় নেই।

দাদাজানের বাড়িতে কেয়ারটেকার সেন কাকা ছাড়াও ছিলেন ধীরেন কাকার স্ত্রী রাধা। উনি রূপবতী ছিলেন। সারাক্ষণই বাড়ি পরিষ্কার রাখার কাজকর্ম নিয়ে থাকতেন। এই দুজন ছাড়াও দবির নামের মধ্যবয়স্ক একজন ছিলেন, যার কাজ গাছপালা দেখা। বাগান করা।

ওই বাড়িতে আমার সময় খুব ভালো কাটছিল। আমি বাগানে দবির চাচাকে দিয়ে দোলনা টানিয়েছিলাম। দোলনায় দুলতে দুলতে গল্পের বই পড়তাম। দাদাজানের লাইব্রেরিতে চামড়ায় বাঁধানো অনেক বই ছিল। বেশিরভাগই প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাস আমি দাদাজানের বাগানের দোলনায় দুলতে দুলতে পড়েছি।

ধীরেন কাকা আমাকে রান্না শেখাতেন। অধ্যাপকের ভঙ্গিতে বক্তৃতা দিয়ে রান্না শেখানো। এই সময় রাধা কাকি তার পাশে থাকতেন। রান্নার বক্তৃতা শুনে মিটিমিটি হাসতেন।

মা! সবচেয়ে কঠিন রান্না মাছ রান্না। মাছের আছে আঁশটে গন্ধ। রান্নার পর যদি মাছের আঁশটে গন্ধ থাকে, তখন সেই মাছ হয় ভূত-পেতলীর খাবার। প্রথমেই আঁশটে গন্ধ দূর করবে।

কীভাবে?

প্রথমে লবণ মেখে কচলাবে। তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে লবণ ফেলে দেবে। এরপর দিবে লেবুর রস। কাগজিলেবু হলে ভালো হয়। এই লেবুর গন্ধ কড়া। লেবুর রস দিয়ে মাখানোর পর আবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে দেবে। সব মিলিয়ে তিন ধোয়া। এর বেশি না। মাংসের ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যবস্থা। মাত্র এক ধোয়া।

রান্না বিষয়ে ধীরেন কাকার সব কথা আমি একটা রুলটনা খাতায় খুব গুছিয়ে লিখেছিলাম। খাতাটা হারিয়ে গেছে। খাতাটা থাকলে রান্নার একটা বই লেখা যেত।

রাধা কাকি ছিলেন ভুতের গল্পের ওস্তাদ। তাঁর কাছ থেকে কত যে গল্প শুনেছি! বেশিরভাগ গল্পই বাস্তব অভিজ্ঞতার। তিনি নিজে দেখেছেন এমন। তাঁর কথায় সব ভূত ভীত প্রকৃতির। মানুষের ভয়ে তারা অস্থির। শুধু একশ্রেণীর পিশাচ আছে, যারা মানুষকে মোটেই ভয় পায় না। এরা হিংস্র জন্তুর মতো।

আমি বললাম, কাকি, আপনি এই ধরনের পিশাচ দেখেছেন?

কাকি বললেন, একবার দেখেছি। আমি এই বাড়ির বারান্দায় বসে। সন্ধ্যা মিলিয়েছে, আমি বড়ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে বারান্দায় এসেছি, তখন দেখলাম পানির নিচ থেকে পিশাচটা উঠল। থপ থপ শব্দ করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে উঠানে দাঁড়াল। মুখ দিয়ে ঘোড়ার মতো শব্দ করল।

দেখতে কেমন?

মানুষের মতো। মিশমিশা কালো। হাতের আঙুল অনেক লম্বা। আঙুলে পাখির নখের মতো নখ। পিশাচটা দেখে ভয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি—এই সময় একটা কুকুর ছুটে এল। কুকুর দেখে পিশাচটা ভয় পেয়ে দৌড়ে পানিতে নেমে ডুব দিল। পিশাচটা কিছুই ভয় পায় না, শুধু কুকুর ভয় পায়। কুকুর তাদের কাছে সাফাৎ যম।

দাদাজানের সঙ্গে আমার তেমন কথা হতো না। তিনি সারাক্ষণ ট্রানজিস্টরে খবর শুনতেন। মাঝে মাঝে তিন মাইল দূরে হামিদ কুতুবি নামের এক পীর সাহেবের আন্তানায় যেতেন। তিনি এই পীরের মুরিদ হয়েছিলেন। যখন ট্রানজিস্টার শুনতেন না, তখন পীর সাহেবের দেওয়া দোয়া জপ করতেন। দাদাজান আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। প্রতিদিনই তার আতঙ্ক বাড়ত। ভবিষ্যৎ জানার জন্যে তিনি এক রাতে ইন্তেখারা করলেন। ইন্তেখারায় দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড কালো শকুন ঠোট দিয়ে আমার চুল কামড়ে ধরে আকাশে উঠে গেছে। আমি চিৎকার করছি, 'বাঁচাও! বাঁচাও'!

দাদাজানের পীর হামিদ কুতুবি স্বপ্নের তাবীর করলেন। কী তাবীর তা দাদাজান আমাকে বললেন না, তবে তিনি আরও অস্থির হয়ে পড়লেন। চারদিক থেকে তখন ভয়ংকর সব খবর আসতে শুরু করেছে। মিলিটারিরা গানবোট নিয়ে আসছে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, নির্বিচারে মানুষ মারছে, অল্পবয়সী মেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এইসব।

একসময় আমাদের অঞ্চলে মিলিটারি চলে এল। খাতিমনগরে মিলিটারির গানবোট ভিড়ল। দাদাজানের বাড়ি থেকে খাতিমনগর বাজার

দু'মাইল দূরে। খবর শোনামাত্র দাদাজান আমাকে নিয়ে তার পীর সাহেবের হজরাখানায় উপস্থিত হলেন।

বিশাল এলাকাজুড়ে পীর সাহেবের হজরাখানা। চারদিকে দেয়াল, দেয়ালের উপর কাটাতার। দুর্গের মতো ব্যাপার। ভেতরে দুটা মাদ্রাসা আছে। একটি ছেলেদের একটি মেয়েদের। হজরাখানার পেছনে পীর সাহেবের দোতলা বাড়ি। একতলার থাকেন পীর সাহেবের প্রথম স্ত্রী। তার কোনো সন্তানাদি নেই। দোতলার থাকেন পীর সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী। তাঁর নাম ছিলেখা। এই স্ত্রীর গর্ভে একটি সন্তান আছে। তাঁর নাম জাহাঙ্গীর। তিনি কোরানে হাফেজ। রূপবান এক যুবক। নম্র এবং ভদ্র। তার সঙ্গে বেশ কয়েকবার আমার দেখা হয়েছে। তিনি কখনো মাথা তুলে তাকান নি।

আমি পীর সাহেবের সামনে বসে আছি। আমার পাশে দাদাজান। পীর সাহেব নামাজের ভঙ্গিতে বসেছেন। তার বয়স অনেক, তবে তিনি শারীরিকভাবে মোটেই অশক্ত না। পীর সাহেবের ডানহাতে তসবি। তসবির দমাগুলি অনেক বড় বড়। তিনি তসবি টেনে যাচ্ছেন। ঘরে আরও কয়েকজন ছিল। পীর সাহেবের নির্দেশে তারা বেরিয়ে গেল। একজন এসে ফরসি ছকা দিয়ে গেল। পীর সাহেব ছকায় টান দিতে দিতে বললেন, সরফরাজ! তোমার এই নাতনির মা বিদেশিনী সেটা জানলাম। তার ধর্ম কী?

খ্রিস্টান।

পীর সাহেব বললেন, মুসলমান ছেলে খ্রিস্টান বিবাহ করতে পারে। নবীজী মরিয়ম নামে এক খ্রিস্টান কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এখন আমার প্রপুত্র, তোমার পুত্রের সঙ্গে খ্রিস্টান মেয়ের বিবাহ কি ইসলাম ধর্মমতে হয়েছে?

জি হজুর।

আলহামদুলিল্লাহ। এটা একটা সুসংবাদ। তুমি তোমার নাতনিকে আমার এখানে রাখতে চাও?

জি জনাব।

মেয়ের বাবা কোথায়?

মেয়ের বাবা কোথায় আমি জানি না। আমার ছেলে তিন বছর বয়সের মেয়েকে এনে আমার কাছে রেখে স্পেনে চলে যায়। এরপর আর তার খোঁজ জানি না।

সে কি জীবিত আছে?

তাও জানি না।

পীর সাহেব বললেন, জ্বিনের মাধ্যমে তোমার পুত্রের সংবাদ আমি এনে দিতে পারি। সেটা পরে দেখা যাবে। এই মেয়ের নাম কী?

অবন্তি।

এটা কেমন নাম ?

তার বাবা রেখেছে।

সন্তানের সুন্দর ইসলামী নাম রাখা মুসলমানের কর্তব্য। আমি এই মেয়ের নাম রাখলাম, মায়মুনা। মায়মুনা নামের অর্থ ভাগ্যবতী।

দাদাজান চুপ করে রইলেন।

পীর সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি কোরান মজিদ পাঠ করতে পার ?

আমি বললাম, পারি।

অজু আছে ?

জি-না।

যাও অজু করে এসে আমাকে কোরান মজিদ পাঠ করে শোনাও।

আমি কোরান শরিফ পড়লাম। পীর সাহেব বললেন, পাঠ ঠিক আছে। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। সরফরাজ, তোমার নাতনি মায়মুনাকে আমি জুলেখার হাতে হাওলা করে দিব। সে নিরাপদে থাকবে। তাকে কঠিন পদার ভেতর থাকতে হবে।

দাদাজান বললেন, আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই সে থাকবে।

পীর সাহেবের কাছে থাকার সময়ই খবর পেলাম, দাদাজানের বাড়িতে মিলিটারি এসে উঠেছে। মিলিটারি ক্যাপ্টেন ঘাটি হিসেবে বাড়ি পছন্দ করেছেন। তাদের নিরাপত্তার জন্যে বাড়ির চারদিকের সব গাছপালা কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধীরেন কাকা এবং তাঁর স্ত্রীকে যে মিলিটারিরা গুলি করে মেরে ফেলেছে—এই খবর তখনো আসে নি।

দাদাজান আমাকে রেখে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। আমার হাতে এক শ' টাকার নোটে দুই হাজার টাকা দিলেন এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আমার ব্যক্তিগত পিস্তলটা তোকে দিয়ে যাচ্ছি। ভালো করে দেখে নে। বারো রাউন্ড গুলি ভরা আছে। সেফটি ক্যাচ লাগানো অবস্থায় ট্রিপার চাপলে গুলি হবে না। সেফটি ক্যাচ কীভাবে খুলতে হয় দেখ। এই ভাবে।

আমি বললাম, সেফটি ক্যাচ খোলার কায়দা জেনে আমি কী করব ? কাকে আমি গুলি করে মারব ?

দাদাজান বললেন, কাউকে মারবি না।

জিনিসটা জানা থাকল।

আমি বললাম, তুমি কোথায় যাবে ?

দাদাজান বললেন, জামি না কোথায় যাব। ঢাকায় যেতে পারি।

মিলিটারিরা তোমার বাড়ি দখল করে বসে আছে। তাদের কিছু বলবে না ?

না।

পীর সাহেবের এই বাড়িতে আমি কতদিন থাকব ?

মিলিটারির গুন্ডি বিদায় না হওয়া পর্যন্ত থাকবি। আমি মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নিব। পিস্তলটা লুকিয়ে রাখবি। পিস্তলের বিষয়টা কেউ যেন না জানে।

কেউ জানবে না।

পীর সাহেবের বাড়িতে আমার জীবন শুরু হলো। খুব যে কষ্টকর জীবন তা-না। দোতলার সর্ব উত্তরের একটা ছোট ঘর আমাকে দেওয়া হলো। ঘরে আমি একাই থাকি। শুধু রাতে ময়না নামের মধ্যবয়স্ক এক দাসী মেঝেতে পাটি পেতে ঘুমায়। ময়নার চেহারা কদাকার। মুখে বসন্তের দাগ, একটা চোখ নষ্ট। মানুষ হিসেবে সে প্রথম শ্রেণীর। প্রথম রাতেই সে আমাকে বলল, অম্মাজি আপনি ভয় খাইয়েন না। আমি আছি।

আমি বললাম, ভয় পাব কী জন্যে ?

ময়না বলল, আপনার বয়স অল্প। আপনে ছরের মতো সুন্দর। কিংবা কে বলবে ছরের চেয়েও সুন্দর। আমি তো আর ছর দেখি নাই। আপনার মতো মেয়েছেলের কাঁহিকে কাঁহিকে (কদমে কদমে) নিপদ। আপনে সাবধানে চলবেন। আমার একটাই নয়ন। এই নয়ন আপনার উপর রাখলাম।

আমি বললাম, একটা নয়ন আমার উপর রেখে দিলে কাজকর্ম করবেন কীভাবে ? তারচেয়েও বড় কথা, নয়ন আপনি আমার উপর রাখছেন কী জন্যে ?

ময়না বলল, ছোট মা'র হুকুম।

ছোট মা হলো পীর সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী। এই মহিলা আরামে এবং আলস্যে সময় কাটান। বেশিরভাগ সময় চুল এলিয়ে উবু হয়ে বসে থাকেন। একজন দাসী তাঁর চুলে বিলি করে দেয়। চুলের উকুন বাড়ে। সপ্তাহে দুদিন বাটা মেদি মাথায় দিয়ে দেয়। আরেকজন দাসী তার পায়ের পাতায় তেল ঘষে। এই দাসীরাই তার কাজা নামাজ আদায় করে।

এই অদ্ভুত মহিলার উপর প্রতি অমাবশ্যা রাতে কিসের যেন আছর হয়। তখন তিনি ঘোঁঘো শব্দ করতে থাকেন। তার মুখ দিয়ে লালা পড়ে। তিনি পুরুষের গলায় বলেন, শইল গরম হইছে। শইলো পানি দে। বরফপানি দে। তখন তাঁর গায়ে বালতি বালতি বরফপানি ঢালা হয়। অমাবশ্যা উপলক্ষ করেই বরফকল থেকে চাক চাক বরফ কেনা হয়। আছরখন্ত অবস্থায় তার তিন দাসী ছাড়া কেউ তার সামনে যায় না।

পীর বাড়িতে আমার জীবনযাত্রাটা বলি। সূর্য ঝটার আগে ময়না আমাকে ডেকে তোলে।

আমাকে ঘাটে নিয়ে যায় অজু করার জন্যে।

ফজরের আজানের পরপর নামাজের জন্যে দাঁড়াতে হয়। ইমামতি করেন পীর সাহেব। মেয়েদের এবং বারো বছরের নিচের বালকদের অল্লাদা নামাজের ব্যবস্থা। পুরুষদের নামাজ এবং মেয়েদের নামাজ একসঙ্গেই হয়, তবে মাঝখানে দেয়াল আছে। নামাজের সমস্ত মেয়েরা ইমামকে দেখতে পারে না, তবে তাঁর কথা শুনতে পারে।

ফজরের নামাজের পরপর মেয়েরা যে যার ঘরে চলে যায়। এই সময় বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে কোরান পাঠ করতে হয়। সকালে নাশতার ডাক এলে কোরানপাঠ বন্ধ হয়। নাশতা হিসেবে থাকে রাতের বাসি পোলাও এবং বাসি মাংস।

জোহরের নামাজের পর দুপুরের খাওয়ার ডাক আসে। দুপুরে গণখাবার রান্না হয়। প্রতিবারই দেড় শ থেকে দু' শ মানুষ খায়। বাড়ির মেয়েরা এই খাবার খেতে পারে কিংবা নিজেদের জন্যে মাছ, ডাল, সবজিও খেতে পারে।

এশার নামাজের পর রাতের খাবার। পীর বাড়ির বাইরের কেউ খেতে পারে না। জিন্নরা রাতের খাবারে অংশগ্রহণ করে বলে (?) রাতে সবসময় পোলাও এবং মাংস থাকে।

আমি ময়নাকে বললাম, জিন্নরা রাতে খেতে আসে ?

ময়না বলল, আসে। পীর বাবার জ্বিন সাধনা। এই কারণেই আসে। মাংস একবার জ্বিন মিলাদ পড়ায়।

আপনি জ্বিন দেখেছেন ?

আমি জ্বিন দেখি নাই, তয় একবার তারার মিলাদে জ্বিলাম। জ্বিনের ক্যানক্যানা মেয়েছেলের মতো গলা। মিলাদের শেষে জ্বিন মুলুকের তবারক ছিল। সবুজ কিসমিস।

খেতে কেমন ?

মিষ্টি, তয় সামান্য ঝাল ভাবও আছে। আপনে যখন আছেন, তখন জ্বিনের মিলাদ নিজের চউখে দেখবেন। জ্বিন মুলুকের ফল ব্রুট ইনশায়াহ খাবেন।

পীর বাবার সঙ্গে এক সন্ধ্যাবেলায় মিলিটারি ক্যাপ্টেন ইশতিয়াক খান দেখা করতে এলেন। জ্বিনের মিলাদ দেখার জন্যে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করলেন। পীর বাবা ক্যাপ্টেন সাহেবের আগ্রহ দেখে বিশেষ ব্যবস্থায় জ্বিনের মিলাদের আয়োজন করলেন। ক্যাপ্টেন সাহেবের আগমন উপলক্ষে বিশেষ খাবারের আয়োজন হলো। দুটি খাসি জবেহ করা হলো। খাসির রেজালা, মুরগির রোস্ট এবং পোলাও।

ক্যাপ্টেন সাহেবের উপস্থিতির কারণে জ্বিনের মিলাদে বাড়ির মেয়েরা উপস্থিত থাকতে পারল



না। ক্যাপ্টেন সাহেব জিনের মিলাদ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি প্রায়ই পীর বাবার হজরাখানায় আসতে শুরু করলেন।

সারা দেশে তখন ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে। দেশের মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে। মিলিটারিরা নির্বিচারে মানুষ মারছে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা অছি পরম সুখে। পীর বাবার হজরাখানা সমস্ত ক্যামেলা থেকে মুক্ত। এখানে প্রতি জুমাবারে পাকিস্তানের জন্যে দোয়া হয়, মিলাদ হয়। একবার খবর পাওয়া গেল, জিনরা বাদগাদে বড় পীর সাহেবের মাজারে মিলাদ করেছে। তারা জানিয়েছে, বাংলাদেশ কখনো স্বাধীন হবে না। দুর্ভাগ্যবশত সবাই মারা পড়বে। জিনেরা নাকি মানুষের চেয়ে কিছু কিছু বিষয়ে উন্নত। তারা ভবিষ্যৎ দেখতে পারে।

জুন মাসের আট তারিখ দুপুরে পীর বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। হজরাখানায় তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তাঁর এক হাতে তসবি অন্য হাতে হুক্কার নল।

পীর বাবা বললেন, তোমার সঙ্গে কি কখনো পাকিস্তান মিলিটারির ক্যাপ্টেন ইশতিয়াকের দেখা হয়েছে?

আমি বললাম, না।

পীর বাবা বিরক্ত গলায় বললেন, ভাবনাচিন্তা করে জবাব দাও। তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখেছেন। তুমি আমবাগানে আম কুড়াতে গিয়েছিলে। তোমার সঙ্গে আরেকজন ছিল।

জি। মরনা ছিল। আমরা পেছনের গেট দিয়ে বাগানে গিয়েছিলাম।

বোরকা ছিল না?

জি-না।

ক্যাপ্টেন ইশতিয়াক তোমাকে দেখেছেন এবং আমার কাছে বিবাহের পত্রগাম পাঠিয়েছেন। তুমি দেশের অবস্থা জানো না। দেশের যে অবস্থা তাতে পাকিস্তান মিলিটারির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

আমি চুপ করে বসে আছি। পীর বাবাও চুপ করে আছেন। তামাক টেনে যাচ্ছেন। একসময় তিনি নীরবতা ভঙ্গ করে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি ক্যাপ্টেন সাহেবকে বলেছি এই মেয়েটির আমার ছেলে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। মিথ্যা কথা বলেছি। মহা বিপদে জীবন রক্ষার জন্যে মিথ্যা বলা জায়েজ আছে। তোমাকে যে কোথাও পাঠাব সেই উপায় নেই। তোমার পিতা কোথায় আছেন তাও জানি না। এমন অবস্থায় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই। আগামী শুক্রবারে বাদ জুম্মা তোমার বিবাহ। এখন সামনে থেকে যাও। একটা কথা মনে রাখবা, যা ঘটে আল্লাহপাকের

হুকুমেরই ঘটে। তাঁর হুকুমের বাইরে যাওয়ার আমাদের কোনো উপায় নেই। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তোমার বিবাহ আল্লাহর হুকুমেরই হবে। আমার হুকুমে না।

আমাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হলো। শুক্রবার বাদ জুম্মা দশ হাজার এক টাকা কবিনে আমার বিয়ে হয়ে গেল। এতদিন জানতাম মেয়ে তিনবার কবুল না বলা পর্যন্ত কবুল হয় না। সেদিন জনলাম লজ্জাবশত যেসব নারী কবুল বলতে চায় না, তারা রেহেলের উপর রাখা কোরান শরিফ তিনবার স্পর্শ করলেই কবুল হয়।

আমার হাত ধরে তিনবার কোরান শরিফ ছুঁয়ে দেওয়া হলো।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে মাগরেবের নামাজের সময় হয়ে গেল আর তখন শুরু হলো নানান ক্যামেলা। একদল মুক্তিযোদ্ধা হজরাখানা লক্ষ্য করে এলাপাখারি গুলি করা শুরু করল। মুক্তিযোদ্ধা নামে একটা দল যে তৈরি হয়েছে তারা যুদ্ধ শুরু করেছে—এই বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না।

মুক্তিযোদ্ধারা কিছুক্ষণ গুলি করে চলে গেল। তাদের গুলিতে কারও কিছু হলো না, শুধু ইরাজ মিয়া নামের একজনের হাতের কব্জি উড়ে গেল। সে রিকট চিৎকার শুরু করল, আমাজি আমারে বাঁচান। আমাজি আমারে বাঁচান। মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে কেউ তাকে হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল না।

ক্যাপ্টেন ইশতিয়াক জিপে করে দলবল নিয়ে এলেন। মিলিটারিরা আকাশের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুড়ে চলে গেল।

আমাবশ্য্য ছাড়াই জুলেখা বিবির উপর জিনের আছর হলো। আজকের আছর অন্য দিনের চেয়েও ভয়াবহ। তিনি পুরুষের গলায় চোঁচাতে লাগলেন, শইল জুইল্যা যায়। বরফপানি দে। বরফপানি দে।

একতলার একটা বড় ঘরে পালংকের উপর আমি বসে আছি। স্বামীর জন্যে অপেক্ষা। এই ঘরেই বাসর হবে। ঘরে আগরবাতি জ্বালানো হয়েছে। বাসরের আয়োজন বলতে এইটুকুই।

আমার স্বামী হাক্কেজ মোহম্মদ জাহাঙ্গীর এলেন শেষরাতে। তাকে বিব্রত এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তিনি খাটে বসতে বসতে কয়েকবার হাই তুললেন। আমি সহজ ভঙ্গিতে বললাম, ইরাজ মিয়ার চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। সে কি মারা গেছে?

তিনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বললেন, হাঁ। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। উনার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না।

আমি বললাম, এখন আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। আপনি ভয় পাবেন না। ভয়ের কিছু নেই।

এই দেখুন এটা একটা পিস্তল। এখানে বারো রাউন্ড গুলি ভরা আছে। সেকটি ক্যাচ লাগানো বলে ট্রিগার টিপলেও গুলি হবে না। এই দেখুন আমি সেকটি ক্যাচ খুলে ফেললাম। এখন ট্রিগার টিপলেই গুলি হবে।

তিনি এতটাই হতভম্ব হলেন যে, তাঁর ঠোঁট নড়ল কিন্তু কোনো শব্দ বের হলো না। আমি বললাম, এখন আমি যদি গুলি করি তাহলে ঋণও শব্দ হবে কিন্তু কেউ এখানে আসবে না। সবাই ভাববে মুক্তিবাহিনী আবার আক্রমণ করেছে।

তুমি গুলি করবে?

আমি বললাম, ভোর হতে বেশি বাকি নেই। আপনি আমাকে যদি লুকিয়ে স্টেশনে নিয়ে ঢাকার ট্রেনে তুলে দেন তাহলে গুলি করব না। যদি রাজি না হন অবশ্যই গুলি করব। এতে মন খারাপ করবেন না। যা ঘটবে আল্লাহর হুকুমেরই ঘটবে। আর আপনি যদি আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন, সেটাও করবেন আল্লাহর হুকুমেরই।

তিনি মূর্তির মতো বসে আছেন। তার দৃষ্টি আমার হাতে ধরে রাখা পিস্তলের দিকে। তিনি খুব ঘামছেন। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছছেন।

ফজরের আজান হলো। তিনি বললেন, চলো তোমাকে নিয়ে শ্যামগঞ্জের দিকে রওনা হই। সকাল নয়টায় একটা ট্রেন ভৈরব হয়ে ঢাকার যায়।

তিনি আমাকে শ্যামগঞ্জের ট্রেনে তুলে দিয়ে চলে যেতে পারতেন। তা করলেন না, আমার সঙ্গে রওনা হলেন। একজন স্বামী তার স্ত্রীকে যতটা যত্ন করে ততটাই করলেন। ট্রেনের কামরা ফাঁকা ছিল। তিনি আমাকে বেঞ্চে পা ছড়িয়ে শুয়ে ঘুমতে বললেন। আমি তা-ই করলাম। পথে কোনো মিলিটারি চেকিং হলো না। কিংবা হয়তো হয়েছে, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম বলে জানি না।

ঢাকার পৌছলাম বিকেলে। তখন ভারী বর্ষণ হচ্ছে। রাস্তায় হাটপানি। রিকশায় ভিজতে ভিজতে বাড়ির দিকে যাচ্ছি। আমার স্বামী বললেন, আমার কিছু ফিরে যাওয়ার ভাড়া নেই।

আমি জবাব দিলাম না।

আমাদের বাড়ির গেট খোলা। বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কানোর পর দাদাজান ভীতমুখে দরজা খুললেন। তিনি দাড়ি রেখেছেন। মুখভর্তি দাড়ির জঙ্গলে তাকে চেনা যাচ্ছে না। আমাকে দেখে তিনি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। টেনে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমার মনেই হলো না একজন মানুষ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। তাঁর ফিরে যাওয়ার ভাড়া নেই।

একটি বিশেষ গুজবের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে আনন্দের ঢাপা উত্তেজনা। স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসব হতে যাচ্ছে। উৎসবের প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শোনা যাচ্ছে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আলোদা মর্যাদা পাবেন। তাদের বেতন বৃদ্ধি ঘটবে। সবার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। যারা বাসা পাবেন না, তাদের এমনভাবে বাড়িভাড়া দেওয়া হবে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশেই বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা হবেন অতিরিক্ত মর্যাদার শিক্ষক।

এখানেই শেষ না, আরও আছে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রস্তাব করা হবে যেন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের আজীবন প্রেসিডেন্ট হন। বঙ্গবন্ধু এই প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে মেনে নেবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এত কিছু পাচ্ছেন, তার বিনিময়ে কিছু তাদের দিতে হবে। এটাই ভদ্রতা এবং শিষ্টতা। শিক্ষকরা সবাই এদিন বঙ্গবন্ধুর 'বাকশাল'—এ যোগদান করবেন। সব শিক্ষকের বাকশালে যোগদানের অঙ্গীকারনামা একটি রুপার নৌকার খোলের ভেতর ভরে সমাবর্তন অনুষ্ঠানেই বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

শিক্ষকদের বাকশালে যোগদানের অঙ্গীকারনামায় দস্তখত সংগ্রহ এর মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তাদের মধ্যে অগ্রহের কোনো কমতি দেখা গেল না। ক্ষমতার সুনজরে থাকা ভাগ্যের ব্যাপার। হাতেগোনা কিছু শিক্ষক অবশিষ্ট বাকশালে যোগদানে রাজি হলেন না। তারা ভীত এবং চিন্তিতমুখে সময় কাটাতে লাগলেন। এদের একজন আমি, রসায়ন বিভাগের সামান্য লেকচারার। আমি কেন উল্টা গীত গাইলাম তা নিজেও জানি না। বহুদলীয় গণতন্ত্র, একদলীয় গণতন্ত্র বিষয়গুলি নিয়ে কখনো চিন্তা করি নি। আমার প্রধান এবং একমাত্র চিন্তা লেখালেখি। তিনটি উপন্যাস বের হয়ে গেছে। চতুর্থ উপন্যাস 'অটিনপুর' রাত জেগে লিখছি। আমাকে ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক আলী নওয়াজ। ছাত্রাবস্থায় তাঁকে যমের মতো ভয় পেতাম। শিক্ষক হয়ে সেই ভয় কাটে নি, বরং বেড়েছে। ছাত্রাবস্থায় অনেকের ভিড়ে লুকিয়ে থাকা যেত। এখন তা সম্ভব না। তাঁর সঙ্গেই ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি থ্যাটিক্যাল ক্লাস নেই। আমাকে সারাক্ষণ তাঁর নজরদারিতে থাকতে হয়।

দুপুরের দিকে নওয়াব স্যারের আলস্যের ব্যথা ওঠে। তাঁর মেজাজ তুঙ্গে অবস্থান করে। আমি তুঙ্গস্পর্শ মেজাজের সামনে দাঁড়ালাম। স্যার বললেন, বসো। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে না। চেয়ার টেনে বসবে। তুমি এখন আমার ছাত্র না, কলিগ।

আমি বসলাম। স্যার বললেন, দুঃখজনক হলেও একটা সত্যি কথা শোনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা হলেন অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্রোতের সঙ্গে থাকতে হয়। কী বলছি বুঝতে পারছ?

আমি বললাম, পারছি।

যাও জাকরের সঙ্গে দেখা করো। সে যা বলবে সেইভাবে কাজ করবে।

আমি বললাম, স্যার। অবশ্যই।

অধ্যাপক জাকর মাহমুদ আমার সরাসরি শিক্ষক। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

পিএইচডি করেছেন। ডিগ্রির সঙ্গে ব্রাইটনের কিছু স্বভাবও নিয়ে এসেছেন। সারাক্ষণ সঙ্গে ছাতা রাখেন। রিকশায় যখন উঠেন, রিকশার হুড ফেলে ছাতা মেলে বসে থাকেন।

এই মেধাবী অধ্যাপক মানুষ হিসেবে অসাধারণ। তিনি বিড়লাধেমিক। তাঁর ঘরভর্তি বিড়াল। এর মধ্যে একটি বিড়াল অন্ধ। বিড়ালটি তাঁর অসম্ভব থ্রি। নিজের শোবার বিছানা তিনি এই অন্ধ বিড়ালের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

জাফর স্যার সম্পর্কে একটি গল্প আগে বলে নেই। এতে মানুষটি সম্পর্কে সবাই কিছু ধারণা পাবেন। তাঁর গাড়ি নেই, সবসময় রিকশায় চলাচল করেন। একদিন তিনি রিকশা থেকে নেমে ভাড়া দিতে গিয়ে দেখেন রিকশাওয়ালার সিটে রক্তের দাগ। স্যার বললেন, এখানে রক্ত কেন?

রিকশাওয়ালার জানাল, কিছুদিন আগে তার পাইলসের অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার পনেরো দিন রিকশা চালাতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গের অচল বলে বাধ্য হয়ে রিকশা নিয়ে বের হয়েছে।

স্যার সেদিনই বেতন তুলেছেন। বেতনের পুরো টাকাটা রিকশাওয়ালার হাতে দিয়ে বললেন, এই টাকায় সঙ্গের চালাবে। পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে রিকশা চালাবে না—এটা আমার অর্ডার।

যাই হোক, আমি জাফর স্যারের সঙ্গে দেখা করলাম। স্যার বললেন, তুমি এখনো পিএইচডি করো নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করতে হলে এই ডিগ্রি লাগবেই। তুমি যে কাও করেছ, এতে সরকারের কাছে বৈধী হয়ে যেতে পার। তখন ফ্লোরশিপেরও সমস্যা হবে। আমার আদেশ, তুমি বাকশালের কাগজপত্রেই সহী করবে।

আমি বললাম, আপনার আদেশের বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি ওঠে না।

বাকশালে যোগদানের কাগজে দস্তখত করার জন্যে রসায়ন বিভাগের অফিসে গেলাম। আমাকে জানানো হলো কাগজপত্র রেজিস্ট্রার অফিসে চলে গেছে। রেজিস্ট্রার অফিসে গিয়ে জানলাম সব কাগজপত্র ভাইস চ্যান্সেলরের বাসায় চলে গেছে। আগামীকাল ভোর সাতটা পর্যন্ত সময় আছে ভাইস চ্যান্সেলরের বাসায় গিয়ে বাকশালে ভর্তি হওয়া। আমি মনে মনে আনন্দিতই ছলাম। স্যারকে বলতে পারব চেষ্টা করেছিলাম।

আমরা তখন থাকি বাবর রোডের একটা পরিত্যক্ত দোতলা বাড়ির একতলায়। সরকার শহীদ পরিবার হিসেবে আমার মাকে সেখানে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এই নিয়েও লম্বা কাণ্ড। এক রাতে রক্ষীবাহিনী এসে বাড়ি ঘেরাও করল। তাদের দাবি—এই বাড়ি তাদের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা এখানে থাকতেন। মা শহীদ পরিবার হিসেবে বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার চিঠি দেখালেন। সেই চিঠি তারা মায়ের মুখের উপর ছুড়ে ফেলল। এরপর শুরু হলো তাণ্ড।

লেপ-তোষক, বইপত্র, বাদ্যর হাঁড়িকুড়ি তারা রাস্তায় ছুড়ে ফেলতে শুরু করল। রক্ষীবাহিনীর একজন এসে মায়ের মাথার উপর রাইফেল তাক করে বলল, “এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে বের হন, নয়তো গুলি করব।” মা বললেন, “গুলি করতে চাইলে গুলি করুন। আমি বাড়ি ছাড়ব না। এত রাতে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাব?”

আমার ছোটভাই জাফর ইকবাল তখন মায়ের হাত ধরে তাকে রাস্তায় নিয়ে এল। কী আশ্চর্য দৃশ্য! রাস্তায় নর্দমার পাশে অভুক্ত একটি পরিবার বসে আছে। সেই রাতেই রক্ষীবাহিনীর একজন সুবাদার মেজর ওই বাড়ির একতলায় দাখিল হলেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে উঠে পড়লেন।

একটি শহীদ পরিবারকে অপমানের হাত থেকে রক্ষার জন্যে দুজন মহৎপ্রাণ মানুষ এগিয়ে এলেন। একজনের নাম আহমদ ছফা। তিনি ঘোষণা দিলেন, বঙ্গবন্দের সামনে গায়ে কেরোসিন ঢেলে তিনি আত্মহত্যা দেবেন। তিনি একটিন কেরোসিন কিনে আনলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হচ্ছেন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সমকালের সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর।

দুজনের চেষ্টায় ওই বাড়ির দোতলায় দুইমাস পরে আমরা উঠলাম। একতলায় রক্ষীবাহিনীর সুবাদার। তিনি কঠিন বৈরিভাব ধরলেন।

আমাদের বাড়ির ছাদটা ছিল আমার খুব পছন্দের। সন্ধ্যার পর ছাদে হাঁটতাম। পাটি পেতে শুয়ে থাকতাম। আকাশের তারা দেখতাম।

রক্ষীবাহিনীর সুবাদার সাহেব একদিন ঘোষণা করলেন, এই বাড়ির ছাদ তার দখলে। আমরা কেউ ছাদে যেতে পারব না। আমাদের রাজি হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। আমার ছাদ-ব্রহ্ম বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা যে বাড়িতে থাকতাম, তার পানির নল সব ভাঙা ছিল। পাইপে করে একতলা থেকে পানি আনার ব্যবস্থা ছিল। সেটাও নির্ভর করত সুবাদার সাহেবের মজির উপর। কোনো কোনো দিন তিনি পানির সাপ্লাই বন্ধ করে দিতেন। আমাদের পানি ছাড়াই চলতে হতো। স্নান বন্ধ।

আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে পরিত্যক্ত বিশাল এক তিনতলা বাড়িতে দলবল নিয়ে থাকতেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। রক্ষীবাহিনী আমাদের রাস্তায় বের করে দেওয়ার পর সাহায্যের আশায় আমি তাঁর কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি অতি তুচ্ছ বিষয়ে তাঁকে বিরক্ত করায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মহা বিপদে মানুষ খড়্‌কুটা ধরে, আমি বঙ্গবীরকে ধরতে গিয়ে দেখি তিনি খড়্‌কুটার মতোই।

সেই সময় ঢাকা শহরে গুজবের অন্ত ছিল না। একটা প্রধান গুজব হলো—সরকারের নির্মূল বাহিনী কাজ করছে। সশস্ত্রভাঙন যুবক ছেলেরা ধরে ধরে নিয়ে যায়, তারপর আর তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না। এই গুজবের কিছু সত্যতা থাকতেও পারে।

সেই সময় নিজেকে নিয়ে আমি খুব ভীত ছিলাম। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় আমার মনে হতো, এই বুঝি দরজায় কড়া নড়বে। আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। শেখ কামালের নামে ভয়ঙ্কর সব গুজব কিংবা রটনা প্রচলিত ছিল। এর একটি ব্যাংক-ডাকাতি বিষয়ক। আমি এই গুজব তখনো বিশ্বাস করি নি, এখনো করি না। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর ছেলেকে বাড়তি অর্থের জন্যে ডাকাতি করার প্রয়োজন পড়ে না। দুঃখের সঙ্গে বলছি, সেই সময় নিজ দেশে আমাকে মনে হতো পরবাসী। দেশটাকে বুকতেও পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল দেশের এন্ট্রপি শুধুই বাড়ছে। থার্মোডিনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র—এন্ট্রপি হলো বিশৃঙ্খলার মাপ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে ঠিকঠাক করে তুলতে সবাই সাহায্য করবে—এটাই আশা করা হয়, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে তখন স্বাভাবিকের রাজত্ব। সব দল বর্ষার কই মাছের মতো উজিয়ে গেছে। মাঠে নেমেছে সর্বহারা দল। যেহেতু তারা সর্বহারা, তাদের আর কিছু হারাবার নেই। তারা নেমেছে শ্রেণীশত্রু স্বতমে। তাদের প্রধান শত্রু আগুয়ামী লীগ। পত্রিকার পাতা উন্টালেই সর্বহারার হাতে নিহত আগুয়ামী লীগ নেতাদের ছবি পাওয়া যায়। সর্বহারার দলের প্রধান সিরাজ সিকান্দার। তিনি ধরাছোয়ার বাইরে।

সর্বহারাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেমেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। তারা বাংলাদেশকে বদলে দেবে। বাংলাদেশ হবে সমাজতান্ত্রিক দেশ। বিশেষ ধরনের এই সমাজতন্ত্র কায়ম শ্রেণীশত্রু স্বতমে দিয়ে শুরু করতে হয়। চলাছে হত্যাকাণ্ড।

গোকুলে বাড়ছে রক্ষীবাহিনী। সাভারে তাদের বিশাল ক্যাম্প। ট্রেনিং-এ আছেন ভারতীয় মেজর রেডি। রক্ষীবাহিনীর পোশাকও ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো। জলপাই রঙের। এই বাহিনীর অফিসাররা ট্রেনিং পেতেন ভারতের দেওয়ান বাটল জুল থেকে। রক্ষীবাহিনীর ‘ফরমেশন সাইন’ ছিল বঙ্গবন্দের সেই বিখ্যাত তর্জনি। এ থেকে মনে করা স্বাভাবিক বঙ্গবন্দের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যই ছিল এই বাহিনীর মূলমন্ত্র। এটা স্বাভাবিকও ছিল, কারণ রক্ষীবাহিনীর সব সদস্যই ছিল প্রাক্তন মুজিব এবং কাদের বাহিনীর সদস্য।

আমি কল্পে স্বভাবের মানুষ। ঝামেলার আঁচ পেলে খেলসের ভেতর ঢুকে বসে থাকতে পছন্দ করি। খেলসের ভেতর আবদ্ধ থেকে দেশের সে সময়কার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আমার পক্ষে করা কঠিন। তারপরও মনে হয়, রক্ষীবাহিনী ছিল সামরিক বাহিনীর প্রতিপক্ষ। এই বাহিনী এমনভাবে সাজানো ছিল যে, অতি দ্রুত তাদের সামরিক বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়া করাণো যায়।

যখন সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দিল তখন রক্ষীবাহিনীর টিকির দেখাও পাওয়া গেল না। অল্পকিছু সেনা সদস্যের বিদ্রোহ দমন তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। বরং তারা উন্টোই

করল। সাভারে রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে তখন ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ। রক্ষীবাহিনী তোফায়েল আহমেদকে নিয়ে কী করতে হবে জানতে চেয়ে বারবার বিদ্রোহীদের কাছে খবর পাঠাতে লাগলেন। ভাবটা এরকম যে আমরা ইস্তিতের অপেক্ষায়। ইস্তিত পেলেই বিদ্রোহী সরকার যা করতে বলবে করব। বাচ্চা হাজির।

রাজনীতির কচকচানি থাকুক, নিজের কথা বলি। আমি তখন চরম অর্থনৈতিক সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমার বেতন এবং বাবার পেনশনের সামান্য (দুইশত) টাকা গোটা পরিবারের সঞ্চয়। মাসের শেষের দিকে মা বের হন ধার করতে। মায়ের পরিচিতজনরা তাকে দেখলেই আতঙ্কিত বোধ করেন।

গোদের উপরে ক্যান্সারের মতো অধ্যয়াজনীয় মেহমান আমাদের বসার ঘর আলো করে বসে থাকেন। এদের একজন কাইয়ুম ভাই। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রাজশাহী বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় খার্ড হয়েছিলেন। ঢাকায় পড়তে এসে তাঁর ব্রাইনে গিটু লেগে গেল। পড়াশোনা বাদ দিয়ে তিনি ইসলামি লেবাস গায়ে তুলে নিলেন। দাড়ি রাখলেন। চোখে সুরমা দেওয়া শুরু করলেন। ধর্মের প্রতি প্রবল আসক্তি যে-কোনো ব্যাসেই আসতে পারে। এটা দোষণীয় না। দোষণীয় হলো—তাঁর মা-বাবা ঢাকায় থাকেন। কাইয়ুম ভাই নিজের বাসা ছেড়ে ভোরবেলা আমাদের বাবর রোডের বাসায় চলে আসতেন। নাস্তা খেতেন, দুপুরের খাবার খেতেন, রাতের ভিনার শেষ করে নিজের বাসায় যেতেন। পরদিন ভোরে আবার উপস্থিত। খেতে বসে প্রায় সময়ই বলতেন, খাবারের মান আরেকটু উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

চালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাসায় রাতে রুটি খাওয়া হতো। শুকনো রুটি কাইয়ুম ভাইয়ের গলা দিয়ে নামে না বিধায় তাঁর জন্যে ভাত করা হতো।

দ্বিতীয় যে মেহমান দ্রুপদ্রুপে মাঝে মাঝে এসে বসে থাকত, তার সঙ্গে আমি ঢাকা কলেজে পড়েছি। সুদর্শন রূপবান যুবক। সবসময় ইংরেজিতে কথা বলত বলে কলেজে তার নাম ছিল ‘ইংলিশম্যান’। ঢাকা কলেজে পড়ার সময় তার পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়ে যায়। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি শুরু করেছি। আমার দায়িত্ব কার্ট ইয়ারের ছাত্রদের স্নাইড রুমের

ব্যবহার শেখানো। হঠাৎ দেখি ক্লাসে মাথা নিচু করে ইংলিশম্যান বসে আছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি ইংলিশম্যান না?

সে উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, Yes sir.

আমি বললাম, তুমি আমাকে স্যার বলছ কেন? তুমি আমার বন্ধু।

সে বলল, Now you are my respected teacher.

তার কাছে তিনদিন অনেকদিন মস্তিস্কবিকৃতি রোগে ভুগে এখন সে সুস্থ হয়েছে। আবার পড়াশোনা শুরু করেছে।

আমি তাকে বাবর রোডের বাসায় নিয়ে গেলাম। তার জন্যে আমি অত্যন্ত বাখিত বোধ করছিলাম। তাকে বললাম, পড়াশোনায় সবরকম সাহায্য আমি করব। আমাকে স্যার ডেকে সে যেন লজ্জা না দেয়। আগে যেভাবে হুমায়ুন ডাকত এখনো তা-ই ডাকবে।

তিন থেকে চার মাস ক্লাস করার পর আবার সে পাগল হয়ে গেল। একদিন হতভম্ব হয়ে দেখি, সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সে ইউনিভার্সিটিতে এসেছে। রসায়ন বিভাগের প্রতিটি ক্রমেই সে চুকে ব্যাকুল হয়ে বলছে, হুমায়ুন কোথায়? হুমায়ুন? My friend and my respected teacher হুমায়ুন?

সে শুধু রসায়ন বিভাগে না, বাবর রোডে আমার বাসাতেও হানা দিতে শুরু করল। সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন সে আসবেই। একটি যুবক ছেলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বসার ঘরে সারা দিন বসে আছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

শুধু একজন বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে নিতেন, তিনি কাইয়ুম ভাই। জাম্বা জোকো পরা মাঙলানা, পাশে নগ্ন ইংলিশম্যান। কাইয়ুম ভাইয়ের ভাবভঙ্গি থেকে মনে হতো বিষয়টা স্বাভাবিক।

১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার। ইউনিভার্সিটিতে কোনো ক্লাস ছিল না। হেঁটে হেঁটে বাবর রোডের বাসায় এসেছি। অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা। আমি রোগাভোগী হওয়ার কারণে বাসে ঠেলাঠেলি করে কখনো উঠতে পারি না। রিকশা নেওয়ার ধনুই আসে না। বাসায় চুকে দেখি, কাইয়ুম ভাই এবং ইংলিশম্যান পাশাপাশি বসা। ইংলিশম্যান যথারীতি নগ্ন। কাইয়ুম ভাই বললেন, হুমায়ুন, তোমরা তরকারিতে

বেশি ঝাল দাও। আমি এত ঝাল খেতে পারি না। তোমার মা’কে আমার জন্যে কম ঝালের তরকারি রাখতে বলবে।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। একবার ভাবলাম বলি, অনেক যন্ত্রণা করেছেন। এখন আমাদের মুক্তি দিন। বলতে পারলাম না। যৌবনের শুরুতে আমি অনেক ভদ্র, অনেক বিনয়ী ছিলাম।

ইংলিশম্যান আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মনে হয় শিক্ষকের প্রতি সম্মান দেখিয়ে দাঁড়ানো। কাইয়ুম ভাইয়ের কথা শেষ হওয়ামাত্র সে গলা নামিয়ে বলল, হুমায়ুন, আমাকে একটা প্যান্ট দাও। কিছুক্ষণ আগে তোমার ছোটবোন শিশু উঁকি দিয়েছিল। তাকে দেখার পর থেকে লজ্জা লাগছে। একটা প্যান্ট দাও। প্যান্ট পরে চলে যাব।

আমার তখন দুটামাত্র প্যান্ট। একটা দিয়ে দেওয়া মানে সর্বনাশ। তারপরেও প্যান্ট এনে তাকে পরালাম। সে ইংরেজিতে বলল, তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। আমার আর কেউ নাই। এইজন্যে তোমাকে একটা খবর দিতে এসেছি। গোপন খবর। কেউ জানে না শুধু আমি জানি। পুরাপুরি পাগল হলে গোপন খবর পাওয়া যায়। খবরটা হচ্ছে, আগামী কাল থেকে রক্তের নদী—River full of fresh blood. Blood blood and blood. কার রক্ত দিয়ে শুরু হবে তা জানতে চাও? জানতে চাইলে তোমাকে বলব আর কাউকে বলব না। মাছিকেও বলা যাবে না।

আমি বললাম, জানতে চাই না।

পাগল প্রলাপ বলবে তা-ই স্বাভাবিক। পাগলের কথার কোনো গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

ইংলিশম্যান গলা নিচু করে বলল, হুমায়ুন, সাবধানে থাকবে।

আচ্ছা থাকবে।

দরজা জানালা বন্ধ করে খাটের নিচে শুয়ে থাকবে।

আমি বললাম, আচ্ছা থাকবে।

ইংলিশম্যান প্যান্ট পরে ঘর থেকে বের হলো। আমাদের বাসা পার হওয়ার পর পর প্যান্ট খুলে ছুড়ে ফেলে নগ্ন হয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। তার পিছু নিল কয়েকটা কুকুর। তারা ঘেঁউ ঘেঁউ করছে, ইংলিশম্যানকে কামড়ানোর ভঙ্গি করছে। ইংলিশম্যান ফিরেও তাকাচ্ছে না। পাগলরা কুকুর ভয় পায় না তা জানতাম না। প্রথম জনললাম। ০

হরিদাসের চুল কাটার দোকান সোবাহানবাগে। তার দোকানের একটু সামনেই ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বর রোডের মাথা। সঙ্গতকারণেই হরিদাস তার সেলুনে সাইনবোর্ড টানিয়ে রেখেছে—

শেখের বাড়ি যেই পথে

আমার সেলুন সেই পথে।

সাইনবোর্ডের লেখা পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবে হরিদাস পথচারীদের জন্যে এই সাইনবোর্ড টানায় নি। তার মনে কীপ আশা কোনো একদিন এই সাইনবোর্ড বঙ্গবন্ধুর নজরে আসবে। তিনি গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসবেন। গম্বীর গলায় বলবেন, সেলুনের সাইনবোর্ডে কী সব ছাত্তা-মাথা লিখেছিল। নাম কী তোর? দে আমার চুল কেটে দে। চুল কাটার পর মাথা মালিশ।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এ ধরনের কথা বলা মোটেই অস্বাভাবিক না, বরং স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি এমন আচরণ করেন বলেই তাঁর টাইটেল বঙ্গবন্ধু।

হরিদাস চুল কাটার ফাঁকে ফাঁকে খন্দের বুকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গল্প ফাঁদে। খন্দেররা বেশির ভাগই তার কথা বিশ্বাস করে। হরিদাস কেঁচি চালাতে চালাতে বলে, “আমার কথা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। যে কেঁচি দিয়া আপনার চুল কাটতেছি সেই কেঁচি দিয়া স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর চুল কেটেছি। তাও একবার না, তিন বার। প্রথমবারের ঘটনাটা বলি, চৈত্রমাসের এগারো তারিখ। সময় আনুমানিক এগারোটাই...”

পনেরোই আগস্ট শেষ রাতে হরিদাস তার দোকানে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙল, মড়মড় শব্দ হচ্ছে—দোকান ভেঙে পড়ছে। হরিদাস ভূমিকম্প হচ্ছে ভেবে দৌড়ে দোকান থেকে বের হয়ে হতভম্ব। এটা আবার কী?

আলিশান এক ট্যাংক তার দোকানের সামনে ঘুরছে। ট্যাংকের ধাক্কায় তার দোকান ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। ট্যাংকের ঢাকনা খোলা। দুজন কালো পোশাকের মানুষ দেখা যাচ্ছে। দোকান ভেঙে ফেলার জন্যে কঠিন কিছু কথা হরিদাসের মাথায় এসেছিল। সে কোনো কথা বলার আগেই ট্যাংকের পেছনের ধাক্কায় পুরো দোকান তার মাথায় পড়ে গেল। পনেরোই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সূচনা করল হরিদাস।

ঢাকা মসজিদের শহর। সব মসজিদেই কজরের আজান হয়। শহরের দিন শুরু হয় মধুর আজানের ধনিতে। আজান হচ্ছে, আজানের ধনির সঙ্গে নিতান্তই বেমানান কিছু কথা বঙ্গবন্ধুকে বলছে এক মেজর, তার নাম মহিউদ্দিন। এই মেজরের হাতে ঝৈনগান। শেখ মুজিবের হাতে পাইপ। তাঁর পরনে সাদা পাঞ্জাবি এবং ধূসর চেক লুঙ্গি।

শেখ মুজিব বললেন, তোমরা কী চাও? মেজর বিব্রত ভঙ্গিতে আমতা-আমতা করতে লাগল। শেখ মুজিবের কঠিন ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়ায়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শেখ মুজিব আবার বললেন, তোমরা চাও কী?

মেজর মহিউদ্দিন বলল, স্যার একটু আসুন।

কোথায় আসব?

মেজর আবারও আমতা-আমতা করে বলল, স্যার একটু আসুন।

শেখ মুজিব বললেন, তোমরা কি আমাকে খুন করতে চাও? পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে কাজ করতে পারে নি সে কাজ তোমরা করবে?

এই সময় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে ছুটে এল মেজর নূর। শেখ মুজিব তার দিকে ফিরে

তাকানোর আগেই সে প্রশংসার করল। সময় ভোর পাঁচটা চল্লিশ। বঙ্গ-পিতা মহামানব শেখ মুজিব সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়লেন। তখনো বঙ্গবন্ধুর হাতে তার থিয় পাইপ।

বহিঃশ নম্র বাড়িটিতে কিছুক্ষণের জন্যে নরকের দরজা খুলে গেল। একের পর এক রক্তভেজা মানুষ মেঝেতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্রবধূ তাদের মাঝখানে রাসেলকে নিয়ে বিছানায় জড়াজড়ি করে শুয়ে ধরধর করে কাঁপছিল। ঘাতক বাহিনী দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল। ছোট রাসেল দৌড়ে আশ্রয় নিল আলনার পেছনে। সেখানে থেকে শিশু করুণ গলায় বলল, তোমরা আমাকে গুলি করো না।

শিশুটিকে তার লুকানো জায়গা থেকে ধরে এনে গুলিতে ঝাঁঝড়া করে দেওয়া হলো। এরপর শেখ জামাল এবং শেখ কামালের মাত্র কিছুদিন আগে বিয়ে হওয়া দুই তরুণী বধূকে হত্যার পাল্লা।

মন্ত্রী সেরনিয়াবত (বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি) এবং শেখ মণি (বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে) বাড়িও একই সঙ্গে আক্রান্ত হলো। সেখানেও রক্তপট। শেখ মণি মারা গেলেন তাঁর অন্তসস্তা স্ত্রীর সঙ্গে, পিতামাতার মৃত্যুদৃশ্য শিশু তাপস দেখল খাটের নিচে বসে। এই শিশুটি তখন কী ভাবছিল? কেবিনেট মন্ত্রী সেরনিয়াবত মারা গেলেন তাঁর দশ-পনের বছরের দুই কন্যা, এগারো বছর বয়সী এক পুত্র এবং মাত্র পাঁচ বছর বয়সী এক নাতির সঙ্গে।

সকাল সাতটা

বাংলাদেশ বেতার ঘনঘন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছে। উল্লসিত গলায় একজন বলছে, “আমি ডালিম বলছি। স্বৈরাচারী মুজিব সরকারকে এক সেনাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে। সারা দেশে মার্শাল ‘ল’ জারি করা হলো।”

দেশ ধমকে দাঁড়াল।

কী হচ্ছে কেউ জানে না। কী হতে যাচ্ছে তাও কেউ জানে না।

মানুষের আশ্রয় মতো দেশের আশ্রয় থাকে। কিছু সময়ের জন্যে বাংলাদেশের আশ্রয় দেশ ছেড়ে গেল।

মেজর জেনারেল জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর শুনে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, প্রেসিডেন্ট নিহত তাতে কী হয়েছে? ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আছে। কনস্টিটিউশন যেন ঠিক থাকে।

বঙ্গবন্ধুর অতি কাছের মানুষ রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ—বসে আছেন রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তর সভারে। আতঙ্কে তিনি অস্থির। রক্ষীবাহিনী আত্মসমর্পণ করে তাকে নিয়ে পড়েছে। তারা বারবার জনতে চাচ্ছে তোফায়েল আহমেদকে নিয়ে কী করবে? বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বিশজন রক্ষীবাহিনী কিম ধরে বসে আছে। এক ঘররার

সাহসী তেজি ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদও কিম ধরে আছেন। শুরু হয়েছে কিম ধরার সময়।

সকাল-সন্ধ্যা কার্ফু দেওয়া হয়েছিল। নিকেলের দিকে বিভিন্ন গলিতে কিছু মানুষ হাটাহাটি শুরু করল। সাহসীদের কেউ কেউ রাস্তার বের হলো। তাদের একজন শফিক। তার মনে ক্ষীণ আশা—কেউ না কেউ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করবে। রাস্তায় মিছিল বের হবে।

রাস্তায় মিছিল বের হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, সেই মিছিল আনন্দ মিছিল।

শফিক বাংলা মোটর গিগে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। সেখানে রাখা ট্যাংকের কামানে ফুলের মালা পরানো। কিছু অতি উৎসাহী ট্যাংকের উপর উঠে নাচের ভঙ্গি করছে।

আমার বাবর রোডের বাসার কথা বলি, যেখানে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একতলায় রক্ষীবাহিনীর সুবাদার পালিয়ে গেলেন। তার দুই মেয়ে (একজন গর্ভবতী) ছুটে এল মার কাছে। তাদের আশ্রয় দিতে হবে। মা বললেন, তোমাদের আশ্রয় দিতে হবে কেন? তোমরা কী করছে? তারা কান্দো কান্দো গলায় বলল, খালাস! এখন পাবলিক আমাদের মেরে ফেলবে।

এই ছোট্ট ঘটনা থেকে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার এবং তাদের উপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও ঘৃণাও টের পাওয়া যায়।

সন্ধ্যাবেলা শফিক এসেছে অবস্থিদের বাড়িতে। অবস্থি বলল, স্যার আপনি আজ কেন এসেছেন! দেশে ভয়ঙ্কর অবস্থা আর আপনি সন্ধ্যাবেলা চলে এসেছেন!

শফিক ধতমত খেয়ে বলল, তোমাদের খোঁজ নিতে এসেছি।

অবস্থি বলল, আমরা ভালো আছি। আপনি এক্ষুনি বাসায় চলে যান।

শফিক বলল, আচ্ছা।

অবস্থি বলল, থাক আপনাকে যেতে হবে না। পথে কেন বিপদ ঘটবে কে জানে! আপনি থেকে যান। পেটকম গোছানোই আছে। সেখানে দাখিল হয়ে যান।

শফিক বলল, তোমার দাদু রাগ করবে। উনি আমাকে পছন্দ করেন না।

অবস্থি বলল, দাদা পছন্দ করবেন বলে এই বিপদে আপনাকে ছেড়ে দেব!

সরকারাজ খান শফিককে দেখে রাগ করলেন না বরং খুশিই হলেন। অগ্রহ নিয়ে বললেন, সাধারণ মানুষের রি-অ্যাকশন কী বোলে। তার আগে তোমার রি-অ্যাকশন বোলে।

শফিক বলল, ভয়ঙ্কর এক ঘটনা ঘটেছে। ভয়ঙ্কর এবং অবিশ্বাস্য। বঙ্গবন্ধুর পাশে কেউ দাঁড়াল না—এটা আমি মেনে নিতেই পারছি না।

কেউ তাঁর পাশে দাঁড়ায় নি এটা ঠিক না। কনুইল শাকীয়েত জামিল ছুটে গিয়েছিলেন। বিদ্রোহীদের গুলিতে মারা গেছেন।

শফিক বলল, কেউ তার পক্ষে রাস্তায় বের হয়ে কিছু বলবে না?

সরকারাজ খাঁ বললেন, তুমি কি বলছে? যেহেতু তুমি চিৎকার করে কিছু বলো নি, অন্যদের দোষ দিতে পারবে না। আমার কথা বুঝে?

জি।

সরকারাজ বললেন, সাহস আছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলার—“মুজিব হত্যার বিচার চাই।”

শফিক বলল, আমার সাহস নেই। আমি খুবই ভীত মানুষ। কিন্তু আমি বলব।

কবে বলবে?

আজ রাতেই বলব।

রাত আটটা। মনে হচ্ছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। খোদকার মোশতাকের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। তিন বাহিনী প্রধান নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। পুরোনো মন্ত্রিসভার প্রায় সবাইকে নিয়েই নতুন মন্ত্রিসভা তৈরি হয়েছে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা যুক্ত হয়েছেন।

মনে হচ্ছে পুরোনো আওয়ামী লীগই আছে শুধু শেখ মুজিবুর রহমান নেই। কী অদ্ভুত কথা! জননেতা মওলানা ভাসানীও কিছুদিনের মধ্যেই নতুন সরকারকে সমর্থন দিলেন।

একজন অবশ্যি প্রতিবাদ করলেন। কঠিন প্রতিবাদ করলেন। তিনি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। তিনি বঙ্গবীরের আচরণই করলেন। দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেলেন। মুজিববাহিনী বাংলাদেশে বাস তাঁর জন্যে অসম্ভব মনে হলো।

আরেকজনের কথা অবশ্যই বলতে হবে। তিনি অভিনেতা আবুল খায়ের। তখন একডিসির এমডি ছিলেন। তিনিও দেশ ত্যাগ করলেন।

পনেরোই আগস্ট রাত নটার দিকে। সরকারাজ খানের বাড়ির সামনে রাস্তায় এক যুবককে চিৎকার করতে করতে সড়কের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত যেতে দেখা গেল। সে চিৎকার করে বলছিল—মুজিব হত্যার বিচার চাই। যুবকের পেছনে পেছনে যাম্বিল ভয়ঙ্কর দর্শন একটি কালো কুকুর।

সেই রাতে অনেকেই রাস্তার দুপাশের ঘরবাড়ির জানালা খুলে অনেকেই যুবককে অগ্রহ নিয়ে দেখছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধও করে ফেলছিল।

আচমকা এক আর্মির গাড়ি যুবকের সামনে এসে ব্রেক কষল। গাড়ির ভেতর থেকে কেউ একজন যুবকের মুখে টর্চ ফেলল। টর্চ সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে ইংরেজিতে বলল, Young man go home try to have some sleep.

শফিককে এই উপদেশ যিনি দিলেন, তিনি ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ।